

আই লাভ ইউ ম্যান - ১

মাসুদ রানা সিরিজ
কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।

হেড অফিস-মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

শনিবার।

শেষ ফাইলটা দেখা শেষ করে রিস্টওয়াচে চোখ বুলাল মাসুদ রানা। দুটো বাজতে এক মিনিট বাকি। নিজের অজান্তেই দরজার দিকে তাকাল একবার। কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। সোহানার আজ হয়েছে কি? ভাবছে ও। কোন প্রোগ্রাম থাকলে আধঘন্টা আগে এসে ঘাড়ে চেপে বসে থাকে, কাজে মন বসাতে দেয় না, কিন্তু আজ সময় পেরিয়ে যেতে চলেছে, অথচ আসার নাম নেই ব্যাপারটা কি? নাকি ভুলেই গেছে...অসম্ভব! অনেক মান-অভিমান ইত্যাদি নারীসুলভ কৌশল খাটিয়ে লাঞ্চার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে ওর কাছ থেকে সোহানা, ভুলে যাবার প্রস্নই ওঠে না।

চেয়ার ছেড়ে একটা হাই তুলল রানা, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর আবার তাকাল দরজার দিকে। বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল ওর চেহায়ায়, একটা বেনসন অ্যান্ড হেজেস ধরিয়ে পা ঝুলিয়ে বসল টেবিলের কিনারায়। আজ একশো একটা জরুরী কাজ সারতে হবে ওকে। একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, একজন অ্যাডভোকেট এবং একজন আর্কিটেক্টের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ওর। ঢাকা এবং লায়নস ক্লাব, দুজায়গায় মীটিং। এছাড়াও অন্তত দুটো পার্টিতে হাজিরা না দিলেই নয়। এতসবের মধ্যে বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছে ও সোহানাকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে। অথচ! চোখের সামনে আবার হাত তুলল ও। আঁতকে উঠে টেবিল থেকে নেমে পড়ল। সর্বনাশ! দুটো প্যাঁচ! সোহানা আজ ডোবাবে। কিন্তু হল কি ওর? ভাবতে ভাবতে নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ল সে, মুখ তুলে

তাকাল টাইপ-রতা সেক্রেটারি, মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে পাশের কামরা পেরিয়ে চলে এল রানা করিডরে।
দ্রুত এগোচ্ছে।

পর্দা ঝুলছে সোহানার কামরায়। খুক করে একটু কেশে ভিতরে ঢুকল রানা। ঢুকেই থমকে গেল।
নিজের চেয়ারে বসে আছে সোহানা, কামরায় আর কেউ নেই। টেবিলের উপর মাথা ঠেকে আছে
তার, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলে ঢাকা পড়ে গেছে মুখ। পায়ের শব্দেও নড়ল না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে
একটা হাত রাখল রানা তার কাঁধে।

কে মেরেছে, কে ধরেছে, কে দিয়েছে গাল? সোহানা, কি হয়েছে?

কিছু না, টেবিল থেকে মাথা না তুলেই বলল সোহানা।

কিছু না তো এভাবে বসে আছ কেন? শরীর খারাপ?

না।

তবে?

ঝট করে হঠাৎ মুখ তুলল সোহানা। অভিমান, ক্ষোভ আর দুঃখের ছায়া দেখল তাঁর মুখে রানা।
জানো, প্রচণ্ড অভিযোগের সুরে বলল সে, আমি নাকি একেবারে জঘন্য ভাবে ব্যর্থ হয়েছি আমার
দায়িত্ব পালনে। আমি যেসব ভুল করেছি সেগুলো নাকি লজ্জাজনক, নতুন এজেন্টরাও নাকি এ
ধরনের ভুল করে না।

তার মানে? এসব কি বলছ তুমি? কিছুই বুঝতে আরছে না রানা।

আরও শুনবে? কার উপর যেন ফুঁসে উঠল সোহানা। আমি নাকি বিয়ে আর ঘর-সংসার বাঁধার
কথাই সবসময় ভাবি, তাই কাজে মন বসাতে পারি না...তারপর-থাক। সে-সব কথা শুনে তোমার
দরকার নেই। বিশ্বাস কর, ডেকে পাঠিয়ে ঝাড়া দুটি ঘন্টা শুধু বকেছে আমাকে...

বকেছে? কে বকেছে?

ওই বুড়ো।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠল রানা।

তুমি হাসছ? আহত বিস্ময়ে চেহারা কালো হয়ে গেল সোহানার।

একটু বকুনি খেয়েছ, তাতেই এই? বলল রানা।

একটু নয়, ঝাড়া দুঘন্টা, একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সোহানা, তোমাকে এসব কথা বলে লাভ নেই।
জীবনে কখনও এই পরিস্থিতিতে পড়নি তো। আমার মত যদি কখনও বকুনি খেতে, তবে বুঝতে
কেমন লাগে...

বুড়ো শুধু বকাঝকা করেছেন তোমাকে, বলল রানা। কিন্তু। মারধর করেননি। নাকি তাও করেছেন?

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সোহানার। রেগে কাই হয়ে গেছে। তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ?

কিংবা, হাসছে রানা। কোন শাস্তি দেননি তো?

একটা হাত লম্বা করে দরজার দিকে আঙুল দেখাল সোহানা। তুমি এখন যেতে পার, রানা।

লাঞ্চ কি তবে...।

সরি, আজ আমার মুড নেই।

দ্রুত রিস্টেওয়াচ দেখে নিয়ে ভাবল রানা, সোহানা মত পাল্টাবার আগেই কেটে পড়া উচিত। ওর
অভিমান ভাঙাবার আরও অনেক সময় পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, চললাম তাহলে, বলে ঘুরে
দাঁড়াল রানা, এগোল দরজার দিকে।

সত্যি চলে যাচ্ছ? প্রায় কাঁদ-কাদ গলায় পিছন থেকে বলল সোহানা।

এই সেরেচে, ভাবতে ভাবতে থামল রানা, ঘুরে দাঁড়াল। বলল, তো কি করব? তুমিই তো বললে...

ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠল সোহানার চেহারা। ঠাট্টা নয়, রানা। এই অপমানের একটা প্রতিশোধ নিতে চাই আমি।

চোখ কপালে উঠে গেল রানার। অপমান? প্রতিশোধ?

হ্যাঁ, দৃঢ় কর্ণে বলল সোহানা। টান দিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা এনভেলোপ বের করল সে। আমি রিজাইন দেব। ধমক খেয়ে চাকরি করা আমার পোষাবে না। রিজাইন লেটার টাইপ করে রেখেছি...

মাই গড! দ্রুত টেবিলের কাছে ফিরে এল রানা। তুমি পাগল হয়েছ, সোহানা? আমাকে যা বলার বলেছ, আর কাউকে বোলো না-শুনলে সবাই হেসে খুন হয়ে যাবে।

বকুনি আমি খেয়েছি, অপমান আমাকে করা হয়েছে...

বকুনি খায়নি কে? সোহানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, এই অফিসে এমন কেউ আছে যে বলতে পারবে চীফের ধমক আর বকাঝকা খেয়ে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে চুপিচুপি কাঁদেনি? তোমাকে অন্য রকম চোখে দেখেন, তাই কখনও বকাঝকা করেননি চীফ, কিন্তু...।

তুমি ঠিক জান সবাইকেই এভাবে বকেন?

যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। বোকা, চীফের ধমক না খেলে কেউ আমরা মানুষ হতে পারতাম ভেবেছ? শুধু বকেন না, কঠোর শাস্তিও দেন তিনি।

শাস্তি?

আমার কথাই ধর না, বলল রানা। চাকরিতে ঢোকান প্রথম দিকের কথা। সাংঘাতিক একটা ভুল করে ফেলেছিলাম। ব্যস, আর যায় কোথায়, এমন শাস্তি দিলেন যে তা মাথা পেতে নেয়ার চেয়ে আত্মহত্যা করে মরে যাওয়া ভাল। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল। একেবারে দ্বীপান্তর!

হোয়াট! চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল সোহানার। বল কি! দ্বীপান্তর? সোহানার চোখে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি।

রিস্টওয়াচ দেখে আঁতকে উঠল রানা, সর্বনাশ!

কি অপরাধে দ্বীপান্তর, বলছ না কেন?

সময় নেই, আরেক দিন বলব, বলল রানা। আমি এখন...

হাতের এনভেলাপটা দেখিয়ে জানতে চাইল সোহানা, এটা তাহলে কি করব? তুমি বলছ সবাইকেই উনি এভাবে...

এস্কুনি ছিড়ে ফেলে দাও ওটা, বলল রানা। কেউ দেখে ফেলবার আগেই। তোমার সাথে কাল ডিনার খাবার কথা থাকল। জরুরী কাজ আছে, চললাম।

ইস, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহানা। চললাম বললেই হল! লাঞ্চ চুলোয় যাক, তোমার দ্বীপান্তরের কথাটা শুনতেই হবে আজ আমাকে। মেয়েদের কৌতূহল কেমন জিনিস, জানো না? রানার হাত ধরল ও। বাইরে যাবার দরকার নেই, পিয়নকে দিয়ে লাঞ্চ আনিয়ে নিচ্ছি-তুমি বস।

ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠল রানার চেহারা। লোকজনকে কথা দিয়েছি, যেতেই হবে আমাকে-বিশ্বাস কর, কথা দিচ্ছি, আরেক দিন সময় করে...

উঁহু, এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে সোহানা। আজই শুনব আমি।

শ্রেফ আপাতত মুক্তি পাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত রাজি হল রানা, বলল, ঠিক আছে, আজই। তবে এখন নয়।

কখন?

রাতে।

কোথায়? জানতে চাইল সোহানা।

তোমার বাড়িতে, বলল রানা। কাজ সেরে রাত দশটায় যাব আমি।

ঠিক?

ঠিক।

বেশ, বলল সোহানা। তারপর রানার হাত ধরে দরজার দিকে ওকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, তাই বলে লাঞ্চটা ফাঁকি দেবে, সেটি হচ্ছে না!

প্রতিবাদ করতে গিয়েও লাভ নেই জেনে চুপ করে গেল রানা। ভাবছে, এখন না হয় লাঞ্চ খাইয়ে বিদায় করা যাবে, কিন্তু রাতে? গল্প শোনার ভূত একবার ঘাড়ে চাপলে ভোর না হওয়াপর্যন্ত নামানো যাবে না। অসম্ভব! সারারাত জেগে অতীত রোমন্থন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে উপায়? হঠাৎ মাথায় সহজতম বুদ্ধিটা এল। কথা দিয়েছে ঠিক, কিন্তু কথা না রাখলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।

তাই করবে ও। আজ রাতে সোহানার বাড়িতে যাবে না।

রাত দশটা পর্যন্ত খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটল রানার। তিনটে পার্টির একটাতেও যাওয়া হয়নি, শরীর সাংঘাতিক ক্লান্ত, এখন। আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, নাকে মুখে দুটো গুঁজেই বিছানা নেবে, কাল রবিবার, বেলা বারোটা পর্যন্ত নাক ডেকে ঘুমাবে ও।

রান্নাবান্না করে রেখে আজ বিকেলে দেশে গেছে রাঙার মা। বাড়ি খালি। গ্যারেজে গাড়ি রেখে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে এল ও, বারান্দায় উঠে দাঁড়াল দরজার সামনে। কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে তালা খোলার সময় সোহানার কথা ভেবে আপন মনে একটু হাসল ও। পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে সে ওর জন্যে। আরও কিছুক্ষণ দেখবে, তারপর ফোন করবে ওকে। কিন্তু ফোন ধরবে না ও। সাড়া না পেয়ে ভাববে, বাড়িতে নেই ও। সাংঘাতিক খেপে যাবে,সন্দেহ নেই। শ্রাগ করল রানা, কিছু করার নেই ওর।

দরজা খুলে বেড়রুমে ঢুকল রানা। অন্ধকারে হাতড়ে বোতাম। টিপে আলো জ্বালল। ছাৎ করে উঠল বুক। ফর্সা দুটো পা দেখা যাচ্ছে বিছানায়। মুখের দিকে তাকাতেই রক্তশূন্য হয়ে গেল ওর। চেহারা-যেন ভূত দেখছে!

তুমি!

চিৎ হয়ে রানার বিছানায় শুয়ে আছে সোহানা। হাসছে। বলল, জানতাম ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে। অপেক্ষা করে ঠকতে মন চাইল না, তাই এখানে চলে এসেছি, বিছানার উপর উঠে বসল সে। হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিংরুমে এস, তোমার সাথে খাব বলে আমিও খেয়ে আসিনি। বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগোচ্ছে সোহানা। কার পাল্লায় পড়েছ সে-খবর রাখো না! কথা দিয়ে গল্প শোনাবে না-চালাকি! রানার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে রাজনন্দিনীর মত গর্বিত ভঙ্গিতে চলে গেল সে।

খেতে বসে আন্তরিকতার সাথে, মৃদু কণ্ঠে বিনয়াবনত ভঙ্গিতে শুরু করল রানা, দেখ, সোহানা, সেটা আমার কাঁচা বয়সের কথা, শাস্তিটা ছিল দ্বীপান্তর, প্রায় চারটে বছর কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি। সেসব আমি স্মরণ করতে চাই না। যা চাও তাই দেব, কিন্তু সেগল্প দয়া করে তুমি শুনতে চেয়ো না। বলার মত তেমন কিছুই ঘটেনি সেখানে। তাছাড়া, আজ আমি ক্লান্ত, ঘুমাতে না। পারলে...স্লীজ...

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে সোহানার। রানার আবেদন যেন তার কানেই ঢোকেনি। সর্বিস্ময়ে প্রায় চাঁচিয়ে উঠল সে, দ্বীপান্তর! মেজর জেনারেল রাহাত খান শাস্তি দিয়ে তোমাকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছিলেন? চটাস করে টেবিলের উপর চাপড় মারল সে, এ গল্প আমার শুনতেই হবে।

সোহানা... করুণ চেহারা দাঁড়িয়েছে রানার।

সবজান্তার ভঙ্গিতে, অতি উৎসাহের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল সোহানা, চাকরিতে ঢোকান প্রথম দিকে প্রায় চারটে বছরের কোন রেকর্ড নেই তোমার ফাইলে-এখন বুঝতে পারছি, ওই সময়টা দ্বীপান্তর ভোগ করেছিলে তুমি। মাই গড! অ্যাডিন এ খবর তুমি চেপে রাখলে কিভাবে? এর জন্যে তো আরও কঠিন শাস্তি পাওনা হয় তোমার-আমার তরফ থেকে। নাও, শুরু করো...

দূর ছাই! চরম বিরক্তির সাথে বলল রানা। কথা বুঝতে চাও না কেন? এতবার করে বলছি সে-সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি..

কিছুই ঘটেনি? তীক্ষ্ণ হল সোহানার দৃষ্টি। চারটে বছর একটা দ্বীপে তুমি কাটালে, অথচ কিছুই ঘটল না-একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

সোহানার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করল রানা। ওকে ইতস্তত করতে দেখে সোহানা উত্তেজিত হয়ে উঠল, খবরদার, মিথ্যে কথা বলে আমাকে এড়াতে পারবে না। তোমার চেহারা বলছে কিছু না কিছু ঘটেছিল-এখনও অস্বীকারকরবে?

হেসে ফেলল রানা।

উত্তর দাও, ঘটেনি কিছু?

চাপের মুখে পড়ে সত্যি কথাটাই বলতে হল রানাকে। ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেছিল-কিন্তু আমার অফিশিয়াল দায়িত্বের সাথে তার তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। চারটে বছরের এই সামান্য ঘটনাটাই শুধু আজও মনে আছে আমার-মনে পড়লেই প্রতিটা খুঁটিনাটি পরিষ্কার জ্বলজ্বল করে ওঠে, বাকি সব ঝাঁপসা, ভুলে গেছি।

জ্বলজ্বল করে ওঠে? ব্যগ্র কৌতূহলে খাওয়ার কথা ভুলে হাত গুটিয়ে বসে আছে সোহানা। তাহলে নিশ্চয়ই সেটা সাংঘাতিক কোন ঘটনা? রানা, প্লীজ, আর আমাকে কষ্ট দিয়ো না-খাওয়া হল তোমার? উঠে পড়, আমি কড়া কফি তৈরি করে আনছি, শুষে শুষে শুনব তোমার দ্বীপান্তরের কাহিনী।

কিন্তু...

এই শালা, কানে তোমার কথা যায় না? ঝট করে উঠে দাঁড়াল সোহানা চেয়ার ছেড়ে। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে হাত রাখল দুকোমরে। অ্যায়সা এক বক্সিং মারব...

একসাথে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল দুজনেই। কিন্তু দ্রুত মুখের চেহারা গম্ভীর করে ফেলল রানা। ঘাড় থেকে ভূত নামানো যাবে না, বুঝতে পেরেছে ও। রাতটা জেগেই কাটাতে হবে। কিন্তু এর বিনিময়ে কিছু আদায় করে নেবার একটা সুযোগ সে-ই বা ছাড়বে কেন!

সোহানা, বলল ও। আমার একটা শর্ত আছে।

তোমার যে কোন শর্ত... রানাকে লোভাতুর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘোর ভাঙল সোহানার, শর্তটা কি তা বুঝে নিল এক নিমেষে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল মুখটা। তবে রে... টেবিল ঘুরে তেড়ে গেল সোহানা। পাজি, শয়তান, সুযোগ-সন্ধানী, ব্ল্যাকমেইলার... রানার বুকের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, তারপর কানে কানে নিচু গলায় বলল, তোমার শর্তটা কি তা আমি শুনতে চাই না। তবে যাই হোক পূরণ করব। কিন্তু গল্প শোনার পর।

বেডরুমের আলো অফ করে দিয়ে অন্ধকারে মুখোমুখি বসে আছে ওরা। পাশেই জানালা, গ্রিল ছুঁয়ে একফালি স্নান চাঁদের আলো চুকে পড়েছে কামরার ভিতর। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে রানা বাগানের দিকে। ফুরফুরে বাতাস লাগছে মুখে, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বারবার। মনটা কেমন উদাস লাগছে। ওর।

খুব কি করুণ কাহিনী, রানা? ফিসফিস করে জানতে চাইল সোহানা। তবে না হয় থাক। কষ্ট পাবে মনে করলে না হয়...

বাগান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল রানা। আবছা অন্ধকারে সোহানার মুখের দিকে তাকিয়ে স্নান একটু হাসল ও। বলল, আবার সব নতুন করে মনে পড়ে গেছে, সোহানা, এখন যদি কাউকে বলতে না পারি, দম ফেটে মরে যাব আমি-রাতের পর রাত ঘুমাতে পারব না। না, এখন আর বাধা দিয়ো না। বলতে দাও আমাকে...কিন্তু, কোথা থেকে শুরু করব, বল তো?

চুপ করে ভাবছে রানা। সোহানাও ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে।

তারপর একসময় সোহানাই নিস্কলতা ভাঙল। একটানা চার বছরের শাস্তি, একেবারে দ্বীপান্তর-কি এমন অপরাধ করেছিলে তুমি যার জন্যে এতবড় শাস্তি পেতে হল তোমাকে?

শাস্তি বাটে, কিন্তু অনেক পরে জেনেছি, সেটা ছিল আমার জন্যে আশীর্বাদ, বলল রানা। ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানো হচ্ছিল আমাকে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান সরকারের, শুধু কার্যকরী করা বাকি ছিল। মেজর জেনারেল রাহাত খান ব্যাপারটা টের পেয়ে তড়িঘড়ি নিজের ঘাড়ে সব দায়িত্ব নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন দ্বীপান্তরে, সেন্ট মেরী দ্বীপে-আসলে প্রাণে বাঁচিয়ে দিলেন তিনি আমাকে।

ফায়ারিং স্কোয়াড! গলাটা কেঁপে গেল সোহানার। কেন? কি করেছিলে তুমি?

নড়েচড়ে বসল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। বলল, তাড়াতাড়ি আসল কাহিনীটা শুরু করতে চাই, তাই সংক্ষেপে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আমি, কেমন? যেখানে বুঝবে না সেখানে প্রশ্ন করে পরিষ্কার হয়ে নেবে।

ঠিক আছে, বলল সোহানা। প্রথম প্রশ্ন-ফায়ারিং স্কোয়াড কেন? রেকর্ডে তো নেই এসব কথা?

সেটা ছিল আমার ট্রেনিং পিরিয়ড, শুরু করল রানা। সেজনেই এ সময়ের ঘটনাগুলো আমার রেকর্ড ফাইলে নেই।

কোথায় ট্রেনিং নিচ্ছিলে?

লগুনে। কোর্সের শেষ পর্যায়ে আকস্মিকভাবে আমি কিছু মূল্যবান তথ্য পেয়ে যাই। সিডনি শেরিডান নামে একজন মিলিওনিয়ার পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে প্রচুর টাকা খাচ্ছিল, বিনিময়ে পাকিস্তান তার কাছ থেকে নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছিল। পি. সি. আই. অত্যন্ত খাতির করত লোকটাকে। হঠাৎ আমি টের পেয়ে যাই এই সিডনি শেরিডান ডাল এজেন্টের ভূমিকা পালন

করছে। সে ভারতের কাছ থেকেও প্রচুর টাকা খেয়ে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত তথ্য পাচার করছে। ব্যাপারটা জানতে পেরে আমার ইমিডিয়েট বসদেরকে বললাম, কিন্তু কেউ আমাকে পাত্তা দিল না। আমার হাতে কোন তথ্য প্রমাণ ছিল না, তাই দমে গেল মনটা। এই সময় আরেকটা ঘটনা ঘটে। এক লর্ডের ছেলে, হেসটিংস আমাকে ডায়মণ্ড স্মাগলারদের একটা গোপন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। গুরুদয়াল সিং, একজন ভারতীয় ডায়মণ্ড স্মাগলার-সবাইকে আমার এই পরিচয় দেয় হেসটিংস। ওরা বিশ্বাস করেছিল। ওখানে আবার আবিষ্কার করলাম সিডনি শেরিডানকে। ডায়মণ্ড স্মাগলারদের রিঙ-লিডার সে। খোঁজ নিয়ে জানলাম বন্ধু সেজে যে লোকটা পাকিস্তানের চরম ক্ষতি করছে এই শেরিডান সেই শেরিডানই। প্রথমে আমার পরিচয় জানতে পারেনি ও, ভারতীয় মনে করে খুব খাতির করত আমাকে। না চাইতেই অত্যন্ত মূল্যবান সব তথ্য পেতাম আমি ওর কাছ থেকে। এবং সে-সব তথ্য পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অ্যাকটিভ এজেন্টদেরকে আমি গোপনে জানিয়ে দিতাম। এভাবেই চলছিল। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না বলে কাউকে কিছু না জানিয়ে গোটা রিঙটাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে বসলাম। এক চিলে দুটো পাখি মারার ইচ্ছে ছিল আমার। সিডনি শেরিডানের মুখোশ উন্মোচনটাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তখন বয়স অল্প, বুঝিনি যে অফিশিয়াল অনুমতি না নিয়ে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া ঘোরতর অন্যায়। যাই হোক, সমস্ত তথ্য আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, লণ্ডন পুলিশ এবং ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে জানিয়ে দিই। একই দিনে আরেকটা দুঃসাহসের পরিচয় দিই আমি, এবং প্রফেশন্যাল লাইফের প্রথম ভুলটা করি। হেসটিংসও একজন স্মাগলার ছিল, তাকে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি আমার। দুজনে ফাঁদ পেতে সিডনি শেরিডানের একটা ব্রিফকেস ভর্তি দুলক্ষ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং দামের ডায়মণ্ড ছিনতাই করি আমরা। শেরিডানকে হাতেনাতে ধরার ইচ্ছে ছিল আমার, ফাঁদটা সেজন্যেই পাতা হয়েছিল, কিন্তু গায়ে আঁচড়টি কাটার সুযোগ না দিয়ে ফসকে গেল সে এবং টের পেল, আমি তার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছি। যাই হোক, হেসটিংসকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে দুঘন্টা পর হোটেলে ফিরে এলাম আমি...

কামরায় ঢুকে দেখ হেসটিংস তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে?

হ্যাঁ, বলল রানা। হাতে পিস্তল। স্রেফ আত্মরক্ষার জন্যেই যা কিছু করলাম আমি, কিন্তু লোকটা যে সাততলার ব্যালকনি থেকে একেবারে নিচে পড়ে যাবে তা ভাবতেই পারিনি।

হোটেল থেকে পালিয়ে কোথায় গেলে তুমি?

ছদ্ম পরিচয় নিয়ে অন্য হোটেলে, বলল রানা। পরদিন সমস্ত খবরের কাগজে বড় বড় হেডিংয়ে খবরটা বের হল। একজন বাদে স্যাগলার চুড়ামণিরা ধরা পড়েছে সবাই। পলাতকের নাম গুরুদয়াল সিং। লর্ড-পুত্র হেসটিংসকে খুন করার অভিযোগও আনা হল আমার বিরুদ্ধে। সাংবাদিকরা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে আভাস দিল গুরুদয়াল সিং এবং তার সহকর্মীদেরকে একটি দেশের স্পাই বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আমি বুঝলাম শেরিডানই এসব তথ্য সরবরাহ করছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে।

ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সোহানা, সিডনি শেরিডানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নাওনি তুমি?

ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারিনি আমি, বলল রানা। লোকটা সাংঘাতিক চতুর, কোন অপরাধের প্রমাণ রাখত না। এর নির্ভুরতা সম্পর্কেও বিচিত্র সব কাহিনী শুনতাম, একটাও অবিশ্বাস করিনি। সিডনি শেরিডানকে ভয় করে না ব্রিটিশ আগ্রার গ্রাউণ্ডে এমন কেউ ছিল না তখন। আমি নিজেও লোকটাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম।

তারপর?

কত বড় ভুল করেছি, বুঝলাম পরদিন, বলল রানা। আমি তখন ব্রিটিশ পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্যে আতঙ্কিত হুঁদুৱের মত ছুটোছুটি করছি। এই সময় পি. সি. আই-এর একটা মেসেজ পেলাম। মেসেজে ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ জানলাম আমি। গোটা ইউরোপ-জোড়া ইন্টেলিজেন্স নেটওঅর্ক আমাদের খতম হয়ে গেছে। আমার সূত্র ধরে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সমস্ত এজেন্ট, অপারেটর এবং কর্মকর্তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেছে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স আর সুইডেন ত্যাগ করতে বলা হয়েছে তাদেরকে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিজের চেষ্টায় ইমিডিয়েটলি ইংল্যান্ড ত্যাগ করে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে হবে। ওখানে গেলে পরবর্তী আদেশ পাব আমি।

ব্রিফকেসটা ছিল তোমার কাছে...

দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং দামের ডায়মণ্ড ছিল। ওতে, বলল রানা। ওগুলো নিয়ে ইংল্যান্ড ত্যাগ করা সম্ভব নয়, আবার ফেলে রেখে যেতেও মন চায়নি। তখন অবৈধ ডায়মণ্ডের

সবচেয়ে বড় ক্রেতা বলতে সিডনি শেরিডানকেই বোঝাত। এত টাকা দামের ডায়মণ্ড একমাত্র তার পক্ষেই কেনা সম্ভব।

কিন্তু সে তো তখন তোমার প্রাণের দুশমন, বলল সোহানা। নিশ্চয়ই তার কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাওনি?

সাহস করে তাই গিয়েছিলাম, বলল রানা। ব্রিটিশ ওভারসীজ ব্যাঙ্কের একজন কর্মকর্তার গোপন চেষ্টারে সিডনি শেরিডানের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। এল সে, এবং আমাকে দেখে আপাদমস্তক চমকে উঠল। দেরি না করে কাজের কথা পাড়লাম আমি। চলতি বাজার দর হিসেবে ডায়মণ্ডের মোট যা দাম হয় তার চেয়ে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং কম দেবে সে আমাকে। ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক পাবেন দশ পার্সেন্ট কমিশন। এই মুহূর্তে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে আমার অ্যাকাউন্টে মোট পাওনার একটা চেক লিখে জমা দিতে হবে তাকে। ভুরু কুঁচকে বেশ কিছুক্ষণ ভাবল শেরিডান। ব্যবসায়ী লোক, প্রস্তাবটা মেনে নিল অবশেষে। কিন্তু সবজান্টা চংয়ের হাসি ঠোঁটে নিয়ে আমার কানে কানে বলল, মনে রেখ, আমার ডায়মণ্ড আমি কিনে নিলাম। এই ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকের সম্মানে আজ তোমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি আমি। কিন্তু ভবিষ্যতে খুব সাবধানে থেকো, গুরুদয়াল। তোমাকে আমি আবার খুঁজে বের করব। মৃদু হেসে বিদায় নিলাম আমি। আমার গ্যারান্টি ছিল ওই ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক। কথা দিয়েছিল শেরিডানকে অন্তত একটি ঘন্টা তার চেষ্টারে গল্লগুজবের মধ্যে আটকে রাখবে সে।

এবং ইংল্যান্ড ত্যাগ করার জন্যে ওই একটি ঘন্টা তোমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

হ্যাঁ, বলল রানা। জাল পাসপোর্ট তৈরিই ছিল, শুধু চেহারা বদল করে নিতে যা একটু দেরি হল। তারপর লণ্ডন থেকে জুরিখ হয়ে প্যারিসের ওরলি এয়ারপোর্ট, সেখান থেকে প্যান অ্যামে চড়ে সোজা সিডনি চলে এলাম। এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করলেন স্বয়ং যমদূত-মেজর জেনারেল রাহাত খান।

ওহ, গড!

হোটেলে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত একটা কথাও বলেননি চীফ, বলল রানা। কিন্তু গাড়িতে দুবার অসুস্থ বোধ করলাম আমি, প্রতিবার মনে হল আমি বোধহয় মারা যাচ্ছি। হোটেল কামরার দরজা নিজের

হাতে বন্ধ করে পকেটে হাত ভরলেন চীফ, অমনি ছ্যাৎ করে উঠল বুকটা। কিন্তু গুলি-টুলি করলেন না। তবে যা বললেন, তখন মনে হচ্ছিল এর চেয়ে মরে যাওয়াও হাজার গুণে ভাল। আমার দেয়া রিপোর্টটা নিঃশব্দে পড়া শেষ করলেন তিনি। তারপর ভুরু কুঁচকে বললেন, শেরিডান ডাবল এজেন্ট, তুমি প্রমাণ করতে পারবে? জান, পাকিস্তানের কত বড় উপকারী বন্ধু সে? আমি বললাম, না, স্যার। বন্ধু নয়, শত্রু-আরও কিছুদিন সময় পেলে আমি প্রমাণ করতে পারব। চীফ বললেন, আমি বিশ্বাস করলাম তোমার কথা-কিন্তু আর কে বিশ্বাস করবে? আমার ইজ্জতটা শেষ করে দিয়েছ, বোকা ছেলে! সরকারকে আমার জবাবদিহি করতে হয়, একথা জান না? একশোবার করে বলে দিয়েছি যেহেতু বাঙালী, প্রতিটা কাজে দ্বিগুণ সাবধান হবে, ভাবনা চিন্তা করে পা ফেলবে-গর্দভ! এখন তোমাকে বাঁচাব কিভাবে বলে দাও!

ফায়ারিং স্কোয়াডের কথা বললেন না?

না। সম্ভবত ভয় পাব বলে কথাটা প্রকাশ করেননি। অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত জানতে চাইলেন, টাকাটা কি করেছ? বললাম, আছে। বললেন, কি করতে হবে কালকে জানতে পারবে। বলেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। কামরা থেকে।

তারপর?

পরদিন বিস্তারিত সব জানানো হল আমাকে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের কাছাকাছি ভারত মহাসাগরে ছোটখাট একটা দ্বীপ, নাম সেন্ট মেরী, সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্যে পোস্টিং দেয়া হয়েছে আমাকে। সুয়েজ তখন বন্ধ, তাই সারা দুনিয়ার তেলবাহী জাহাজ ওই সমুদ্র পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে। সব দেশের এসপিওনাজ নেটওয়ার্ক তৎপর ওখানে। তাছাড়া, এলাকাটা আন্তর্জাতিক স্মাগলারদের স্বর্গ বিশেষ। আমার কাজ হবে সমস্ত এসপিওনাজ নেটওয়ার্কের মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করা এবং আরও নানান সূত্রে পাওয়া ইনফরমেশন হাই ফ্রিকোয়েন্সির অয়্যারলেসের মাধ্যমে কায়রোর পি. সি. আই-এর ব্রাঞ্চ অফিসে পাঠানো। প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার ব্যাপারে কঠোর ভাবে নিষেধ করে দেয়া হল আমাকে। মনটা একেবারে দমে গেল আমার।

কেন?

ভারত মহাসাগরের এই এলাকায় শুধুমাত্র অযোগ্য অপারেটরদেরকে পাঠানো হত, বলল রানা। আসলে তেমন কোন কাজ ছিল না ওখানে-শুধু সময় কাটানো। যাই হোক, এরপর এল নির্দেশের বিশদ ব্যাখ্যা। একশো পঁচিশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং দিয়ে একটা বোট কিনতে বলা হল আমাকে। সেন্ট মেরী দ্বীপে আমার পরিচয় হবে, আমি পাকিস্তানী বাইশ পরিবারের কোন এক পরিবারের এক অভিমানী ছেলে, মা-বাবার সাথে রাগ করে একটা বোট নিয়ে সেন্ট মেরী দ্বীপে এসে পড়েছি, এবং দ্বীপটা আমার ভাল লেগে গেছে। তাই স্থায়ী ভাবে থাকার জন্যে সেন্ট মেরীর নাগরিকত্ব পাবার জন্যে আবেদন জানিয়েছি।

এবং ঠিক তাই করলে তুমি?

হ্যাঁ, বলল রানা। তাই করলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেল খুদে দেশটা আমার। দ্বীপটা খ্রিস্টান প্রধান, তবে অল্প কিছু বহিরাগত হিন্দু এবং মেইন ল্যান্ড থেকে আসা মুসলমানও আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা সবাই নিগ্রো-গায়ের রঙ কালো, মাথায় কঁকড়া চুল খুলি আঁকড়ে বসে আছে, কিন্তু চোখগুলো ধবধবে সাদা। দ্বীপবাসীরা সবাই সরল প্রাণ। ভালবেসে ফেললাম। বিনিময়ে পেলাম ওদেরও অকুণ্ঠ আতিথেয়তা এবং আন্তরিক প্রীতি। আমাকে ওদের ভাল লাগার কারণও ছিল। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিল কোটিপতির একমাত্র সন্তান আমি, অথচ জীবিকা অর্জনের জন্যে উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করি। ওদের চোখে আমি ছিলাম ভিনদেশী এক রাজপুত্র-যে সাধারণ প্রজাদের সাথে বসবাস করার জন্যে, তাদের দুঃখকষ্টের ভাগীদার হওয়ার জন্যে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে নেমে। এসেছে পর্ণ কুটিরে।

দ্বীপটা কেমন, রানা? ফিসফিস করে জানতে চাইল। সোহানা।

স্বর্গ, এক কথায় জবাব দিল রানা। বোটে একগাদা ফুয়েল ড্রাম তুলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে রওনা দিই আমি। এই দুহাজার মাইল পাড়ি দেবার সময় প্রেম হয় আমার সাথে জলকুমারীর...

জলকুমারী?

তোমার সতীন, মৃদু হেসে বলল রানা। ভয় পেয়ো না, বেঁচে নেই সে। গল্পটা আমার বোট এই জলকুমারীকে নিয়েই। আর... হঠাৎ খাদে নেমে এল রানার কণ্ঠস্বর, ...আর দ্বীপে পা দিয়েই কুড়িয়ে

পেলাম দুটো সোনার টুকরো-রডরিক আর ল্যাম্পনি। আমার গল্প ওদেরকে নিয়েও। একটু থেমে আবার শুরু করল রানা, দ্বীপে উঠেই কিনলাম পঁচিশ একর ছায়া সুনিবিড় শান্তি, সেখানে নিজের হাতে তৈরি করেছি চারটে কামরা, চওড়া একটা বারান্দা, বাগান আর লতা-ঝোপের বাউণ্ডারি ওয়াল। আম গাছ দিয়ে ঘেরা বাড়িটা থেকে সাদা সৈকত দেখতে পাওয়া যায়। শোনা যায় সাগরের উদাত্ত আছান।

অপূর্ব-রানা, ওই দ্বীপে আমার যেতে ইচ্ছে করছে, ফিসফিস করে বলল সোহানা। তারপর?

তিন বছর কেটে গেল ওখানে, বলল রানা। এর মধ্যে তেমন কিছুই ঘটেনি। ইতিমধ্যে শুধু দ্বীপের একজন হয়ে উঠেছি আমি। সবাই ধরে নিয়েছে, এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যাব না আমি। নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করার ছয় বছর পর স্থায়ী। নাগরিকত্ব পাবার কথা। সবাই জানে, তখনই আমি নাগরিকত্ব পেয়ে গেছি, তিন বছর পর শুধু আনুষ্ঠানিকতাটুকু সম্পন্ন হবে।

তারপর?

সাঁতার কাটি, বোটটাকে ভাড়া খাটাই, মদ খাই, গান করি-তারপর এল মাছের মওসুম। সোহানা, গল্প শুরু হল। কিন্তু আজ এই পর্যন্তই থাক, কেমন? রাত তো অনেক হল। গৌরচন্দ্রিকা শেষ, আবার অন্য একদিন শুরু করা যাবে মূল কাহিনী, কি বল?

আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব। কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠস্বরটা রানার কানে অকৃত্রিম বলেই মনে হল।

হাসল রানা। ঠিক আছে, তবে শোনো। কিন্তু তার আগে...

আবার কি? অসহিষ্ণু কণ্ঠে জানতে চাইল সোহানা।

গরম কফি হলে জমত, কি বল?

এক্ষুনি, স্যার। চেয়ার ছেড়ে দমকা বাতাসের মত আঁচল উড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সোহানা।

দুই

সেবারের মওসুমে অনেক দেরি করে এল মাছ। বোট এবং ক্রুদের গাধার খাটনি খাটাচ্ছি, প্রতিদিন উত্তর দিকে বহু বহু দূর চলে যাচ্ছি, নিশ্চিতি রাতে ফিরে আসছি গ্র্যাণ্ড-হারবারে-খালি হাতে। দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা কেটে যাচ্ছে-কিন্তু কই, কোথায় মারলিন! তারপর হঠাৎ একদিন, নভেম্বরের রোদ ঝিলমিল সাগরে ঝিক করে হেসে উঠল আমাদের ভাগ্য। মোজাম্বিক স্রোতের স্বচ্ছ নীল-বেগুনি চেউয়ের সফেন মাথা থেকে বড়সড় একটাকে নামতে দেখলাম আমি।

ইতিমধ্যে একটা মাছের জন্যে মরিয়া জেদ চেপে গেছে আমার। ক্রুসহ বোটটাকে চাটার করেছে টাকার কুমীর টনি রুমার, নিউ ইয়র্কের একটা বিজ্ঞাপন সংস্থার মালিক। লোকটা আমার বাঁধা খান্দের। গত তিন বছর ধরে প্রতি মওসুমে ছয় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে বড় মারলিনের আশায় তীর্থ করতে আসছে সে সেন্ট মেরী দ্বীপে। বেঁটে, লালমুখো বানরের মত চেহারা, কিন্তু সদালাপী-লক্ষ্মী খান্দের হিসেবে তাকে পছন্দ করি আমি। আর প্রাণচঞ্চল তরুণ বোট মালিক মাসুদ রানার উপর ভরসা করার একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছে রুমারের। চেহারা যাই হোক, মনে অসীম ধৈর্য আর গায়ে শক্তি আছে রুমারের, বড় মাছ নিয়ে খেলতে হলে যা একান্ত দরকার।

পানির উপর দুই হাতের চেয়েও বড় গোটা ফিন দেখে হুঁয় করে উঠল আমার বুক। ডগার দিকটা চওড়া এবং বাঁকানো দেখেই বুঝে নিলাম ওটা মারলিন-শার্ক বা পরপয়জ নয়। আমার সাথে একই সময়ে মাছটাকে দেখতে পেয়েছে জিলেট ল্যাম্পনি, ফোরডেকে দাঁড়িয়ে মাস্তুলের দড়িদড়া ধরে ঝুলে পড়ল সে, উত্তেজনায় চৈঁচাচ্ছে। পাকানো দড়ির মত চুলের গোছাগুলো রোদ পোড়া মুখের দুদিকে দোল খাচ্ছে তার।

সাঁৎ করে তীরবেগে চেউয়ের মাথায় চড়ছে মাছটা, গতি মন্থর হয়ে এলে মুহূর্তের জন্যে চেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছে। তার চারপাশ থেকে সরে যাচ্ছে পানি, ব্যাণ্ডের মত লাগছে দেখতে অনেকটা-কালো, ভারী, বিশাল। সাবলীল ভঙ্গিতে বাঁক নিচ্ছে। মাছটা, সেটার অনুকরণে বাতাস লাগা পতাকার মত চেউ জাগছে পিঠের পাখনায়। চেউয়ের মাথা থেকে পিছলে নামছে সে পরবর্তী। চেউয়ের মাঝখানে, হুড়মুড় করে ছুটে এসে ঢেকে দিচ্ছে পানি তার ঝলমলে চওড়া পিঠ।

ঘাড় ফিরিয়ে ককপিটের দিকে তাকালাম। এরই মধ্যে টনি রুমারকে ফাইটিং চেয়ারে বসতে সাহায্য করছে ফিলিপ রডরিক। বেল্ট দিয়ে চেয়ারের সাথে রুমারকে আটকে সিঁধে হয়ে দাঁড়াল। সে, মনে হল বোটে একটা হিমালয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যেন। প্রকাণ্ডদেহী বুনো ভালুকের সাথে রডরিকের পার্থক্য শুধু এটুকু যে বুক ছাড়া তার শরীরে কোথাও তেমন লোম নেই। গায়ের রঙ শুধু কালো বললে রঙের উজ্জ্বলতাকে অপমান করা হয়। কালো মার্বেল পাথরের মত আশ্চর্য একটা স্বচ্ছ গভীরতা এবং দ্যুতি আছে সেখানে। মস্ত থাবায় ঢাকা পড়ে গেল তার প্রকাণ্ড মুখটা, সশব্দে চপ করে একটা চুমো খেল সে, তারপর হাতটা ছুঁড়ল আমাকে লক্ষ্য করে। প্রতীক্ষার অবসানে, নগদ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় উত্তেজনার ঢেউ লাগছে তার শরীরেও। কিন্তু আমাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে নৈরাশ্যবাদী লোক সে-ই, আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব দুলছে তার বুক। বলল, বড় সতর্ক, সাত ঘাটের পানি খাওয়া মাছ।

নিঃশব্দে হাসছি আমি, ওর কথায় কান দিয়ো না টনি, বললাম, একটু সবুর কর, দেখ কিভাবে বাধিয়ে দিই মাছটা।

এক হাজার ডলার বাজি, ঢোক গিলে চাপা গলায় বলল টনি রুমার। এ বাজি জিতে নয় হেরে আনন্দ পেতে চায় সে। উত্তেজনায় চকচক করছে তার চোখ দুটো।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। হাজার ডলার বাজি হারার সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু পরমুহূর্তে বুক টান করে জোর গলায় জানিয়ে দিলাম, রইল তাই। তারপর মন দিলাম মাছের দিকে।

ঠিক ধরেছে রডরিক, এসব মাছের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার দিক থেকে গোটা ভারত মহাসাগরে রডরিকের জুড়ি নেই। প্রকাণ্ড মাছটা সতর্ক, সাবধান হয়ে আছে।

যত কায়দা-কৌশল জানা আছে, এক এক করে সবগুলো খাটিয়ে পাঁচবার টোপ সাধলাম মাছটাকে। প্রতিবার বাঁক নিয়ে সরে গেল সে। নাক ঘুরিয়ে যতবার তার ঠোঁটের সামনে দিয়ে যেতে চাইল জলকুমারী, প্রতিবার ডুব দিয়ে ফাঁকি দিল সে।

রডরিক, আইস-বক্সে তাজা একটা ডলফিন টোপ আছে, মরিয়া হয়ে বললাম আমি বের করে আনো ওটা।

মাছটাকে এবার ডলফিন সাধলাম। টোপটা অনেক খেটে নিজে তৈরি করেছি আমি, স্বাভাবিক সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতরে বেড়াচ্ছে পানির নিচে সেটা। টোপ গ্রহণ করার মুহূর্তটা চিনতে পারলাম। মারলিনের বিশাল দুই কাঁধ নিমুখী হয়ে যাচ্ছে দেখে। তীক্ষ্ণ হল আমার দৃষ্টি। পরমুহূর্তে গড়ান দিয়ে বাঁক নেবার সময়। এক ঝলক আলোর মত দেখতে পেলাম পেটটা-পানির নিচে একটা আয়না যেন ঝিক করে উঠল।

ধাওয়া করছে! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার ছাড়ল ল্যাম্পনি। ডেক থেকে পা খসে পড়ল তার, দড়ি ধরে দোল খাচ্ছে সে বানরের মত।

সকাল দশটার দিকে খেলাবার জন্যে রুমারকে ছিপটা দিলাম আমি। তার আগে টানাইঁচড়া করে বেশ অনেকটা কাছে নিয়ে এলাম সেটাকে। পানিতে বেশি লাইন থাকলে অতিরিক্ত চাপ পড়ে রড ধরা লোকটার ওপর। দাঁতে দাঁত চেপে ফাইবার গ্লাসের ভারী রড ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়াটাই একমাত্র কাজ নয় আমারটোপ গিলেই উন্মত্তের মত মুখ ঝাঁপটা দিয়ে বড়শি ছাড়াতে চেষ্টা করছে মাছটা, না পেরে আতঙ্কিত হয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটেছে, লাফ দিয়ে উঠে যাচ্ছে পানির উপর দিয়ে, ঝপাৎ করে পড়ছে। আবার-সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে বোট চালাচ্ছি আমি, অনুসরণ করে যাচ্ছি মাছটাকে।

দুপুরের খানিকটা পর অবশেষে পরাস্ত করল রুমার মাছটাকে। পানির উপর আসতে বাধ্য হয়েছে মাছটা, বিশাল একটা বৃত্ত রচনা করে প্রথমবার চক্রর মারা শেষ করেছে এই মাত্র। এখন শুধু প্রতি চক্রের খানিকটা করে কাছে টেনে নিয়ে আসবে তাকে রুমার।

হেই, বস! আমার মনোযোগ ভেঙে দিয়ে হঠাৎ ডাকল ল্যাম্পনি। একজন অতিথি এসেছেন!

ব্যাপারটা কি, ল্যাম্পনি?

উজান ঠেলে আসছেন বড় সাহেব, হাত তুলে দেখাল ল্যাম্পনি। মারলিনের মুখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, গন্ধ পেয়েছেন তিনি।

ল্যাম্পনির হাত অনুসরণ করে তাকাতেই হাঙ্গরটাকে দেখতে পেলাম। সোজা, একরোখা গতিতে পানি কেটে এগিয়ে আসছে একটা ভোঁতা ফিন। শুধু রক্তের গন্ধে নয়, পানির তোলপাড়েও আকৃষ্ট হয়েছে সে। প্রকাণ্ড একটা হ্যামারহেড হাঙ্গর এটা, দেখেই বুঝলাম। ব্রিজে এস তুমি জলদি, ল্যাম্পনি! হাঁক ছাড়লাম আমি।

দেখ, রানা, দরদর করে ঘামছে টনি রুমার, দুহাত দিয়ে চেপে ধরে আছে সে রডটা, মাথা কাত করে কাঁধের কাপড়ে জুলফি আর কান ঘষে নিয়ে উত্তেজিতভাবে বলল, শালা খচ্চরটা যদি আমার মাছে একটা দাঁতও বসাতে পারে, হাজার ডলারের কথা ভুলে যেতে হবে তোমাকে।

ল্যাম্পনিকে হুইল দিয়ে তিন লাফে ছুটে মেইন কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম আমি। ঝপ করে হাঁটু গেড়ে বসেই দড়ির গিট খুলে ইঞ্জিন হ্যাচটা সরিয়ে দিলাম, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে গহ্বরের ভিতর, ডেকিংয়ের নিচে হাত গলিয়ে ইনার টিউবের গোপন সিলিংয়ে ঝোলানো এফ-এন কারবাইনের স্টকটা মুঠো করে ধরলাম।

ডেকে বেরিয়ে আসার আগেই রাইফেলের লোডিং চেক করা হয়ে গেছে আমার, বুড়ো আঙুলের ঠেলা দিয়ে সিলেক্টরের কাটা অটোমেটিক ফায়ারের ঘরে নিয়ে গেলাম।

ল্যাম্পনি, দ্রুত কণ্ঠে বললাম, বড় সাহেবের পাশে নিয়ে চল বোট।

জলকুমারীর বো-তে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে পড়েছি আমি, বাগিয়ে ধরে আছি কারবাইনটা। কোর্স বদলে সোজা হাঙ্গরটার দিকে এগোচ্ছে বোট, দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব-এখন আর কোন সন্দেহ নেই আমার, হ্যামারহেডই। ডগা থেকে লেজ পর্যন্ত বারো ফুট লম্বা, স্বচ্ছ পানির নিচে গায়ের রঙ তামাটে ঝোঞ্জ। মাথার আকৃতি বদলে সমতল হয়ে গেছে যেখানটা, দুই অক্ষিগোলকের মাঝখানে, সতর্কতার সাথে লক্ষ্য স্থির করেই ছোট্ট করে ড্রিগারে একবার চাপ দিলাম আমি। গর্জে উঠল এফ-এন, অশ্বট্টা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা খালি পিতলের কেস, এবং সাগরের পানি দ্রুত ছলকে উঠল বার কয়েক।

গোটা শরীর ঝকি খাচ্ছে হাঙ্গরটার। মাথার চামড়া ফুটো করে ভিতরে ঢুকে গেছে বুলেটগুলো, ধবধবে সাদা খুলির হাড় চুরমার করে দিয়ে ছোট্ট মগজটুকু উড়িয়ে দিয়েছে। উল্টে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে সে।

থ্যাঙ্কস, রানা, ভেজা টকটকে লাল মুখটা শার্টের আঙ্গিনে মুছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল রুমার।

সেবা পরম ধর্ম, মুচকি হেসে ল্যাম্পনির কাছ থেকে হুইল। নেবার জন্যে চলে গেলাম আমি।

খুব ভোগাল মাছটাকে রুমার, যতভাবে সম্ভব শাস্তি দিয়ে লাইন গুটিয়ে ধীরে ধীরে টেনে আনল বোটের কাছে। ছড়ানো লেজটা পানির উপর নিস্তেজভাবে বাড়ি খাচ্ছে। দীর্ঘ ঠোঁট জোড়া দ্রুত ফাঁক আর বন্ধ হচ্ছে। চকচকে চোখটা পাকা আপেলের মত। দীর্ঘ শরীরে হাজারখানেক উজ্জ্বল রূপালী, সোনালী আর রয়্যাল পারপল রঙের চোখ ধাধানো টানা লম্বা দাগ।

স্টেনলেস স্টীলের লম্বা রড হাতে অপেক্ষা করছে রডরিক, রডের শেষ মাথায় তিন কাটার ভুকটা রোদ লেগে ঝিলিক মারছে। দস্তানা পরা হাত দিয়ে ভুকহীন আরেকটা রড ধরেছি আমি, ধীরে। ধীরে টেনে আনছি মারলিনকে রডরিকের দিকে। ঠিক জায়গা মত বেঁধানো চাই, বললাম ওকে।

তাচ্ছিল্যের সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল রডরিক, ভাবটা যেন, ছেলেমানুষের কথা এভাবেই উড়িয়ে দিতে হয়।

চেউটার জন্যে অপেক্ষা কর, ঠাট্টা করে উপদেশের সুরে। সাবধান করছি ওকে। অন্য সময় হলে বোটটা দুলে উঠত রডরিকের অট্টহাসিতে। কিন্তু মারলিন তার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে এখন। আমার অহেতুক উপদেশ কানে ঢুকতে ঠোঁটের কোণ একটু বাঁকা হল শুধু।

চেউটা উঁচু করে ধরল মাছটাকে। পানি সরে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল দুদিকের ছড়ানো পাখনার মাঝখানে পারদের মত চকচকে চওড়া বুক। এইবার! রুদ্ধশ্বাসে বললাম আমি। হেঁইয়ো! হুঙ্কার ছেড়ে তিন কাঁটাওয়ালা ভুকটা থ্যাচ করে মারলিনের বুকে গোঁথে দিল রডরিক। উজ্জ্বল ক্রিমসন রঙের রক্ত ছুটল ফোয়ারার মত। মৃত্যু যন্ত্রণায় হটফট করছে পানির উপর মাছটা, সাদা ফেনার একটা

পাহাড় সৃষ্টি হচ্ছে তার চারপাশে, কয়েকশো গ্যালন লোনা পানি ছিটকে আসছে লেজের ঝাঁপটায়, ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের সবাইকে।

ক্রেনের ডেরিক থেকে নামিয়ে অ্যাডমিরালটি জেটিতে ঝুলিয়ে দিলাম মাছটাকে। হারবার মাস্টার বেনসন সার্টিফিকেট সই করার সময় মাছের ওজন লিখল আটশো সতেরো পাউণ্ড। চোদ্দ ফুট হয় ইঞ্চি লম্বা।

ওদিকে ভক্তরা উল্লাসে মেতে উঠেছে, একদল কালো মাণিক ওরা, ছয় থেকে তেরো চোদ্দ বছর বয়স। কেউ খালি গায়ে, কারও শার্টের বোতাম ছেঁড়া, রাস্তাগুলো ধরে খালি পায়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে তারা সবাই। চাঁচাতে চাঁচাতে ফুলে উঠেছে সবার গলার রং। জেটিতে রানা ভাই পাহাড় ঝুলিয়েছে! জেটিতে রানা ভাই...।

দ্বীপবাসীদের জন্যে এর চেয়ে মোক্ষম অভ্যুত্থান আর হতে পারে না। কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে উৎসুক কৌতূহলে দলে দলে ছুটে আসছে সবাই। দেখতে দেখতে উৎসবমুখর হয়ে উঠল বন্দর এলাকা।

কথাটা গভর্নমেন্ট হাউজ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল। অবিরাম হর্ন বাজিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটে আসছে প্রেসিডেনশিয়াল ল্যাণ্ড রোভার, বনেটের একধারে পতপত করে উড়ছে রাষ্ট্রীয় পতাকা। ভিড় দুভাগ করে ছুটে এসে জেটির কাছে থামল গাড়িটা। প্রায়। ছিটকে নেমে এলেন মহৎ হৃদয় ব্যক্তিটি। জন্মসূত্রে দ্বীপের বাসিন্দা যারা তাদের মধ্যে স্বাধীনতার আগে একমাত্র শিক্ষিত এবং আইনবিদ ছিলেন গডফ্রে পিডল। তার শিক্ষা জীবন কেটেছে লণ্ডনে।

মিস্টার রানা...ও মাই গড! মাছটাকে চাম্ফুষ করে আনন্দে চাঁচিয়ে উঠলেন তিনি। কি সাংঘাতিক! কি ভয়ঙ্কর! এই নমুনা দেখে ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসবে টুরিস্টরা, আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে আমাদের টুরিস্ট ব্যবসা! এগিয়ে এসে সহাস্যে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকি দিলেন তিনি, হাতখানেক নিচে থেকে মুখ তুলে। তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। মিনার বসানো কালো টুপি পরা সত্ত্বেও আমার বগল পর্যন্ত কোনরকমে পৌঁছেছেন তিনি।

থ্যাঙ্ক ইউ, মি. প্রেসিডেন্ট, স্যার, মৃদু হেসে বললাম। কালো গায়ের রঙ ঢাকার জন্যেই কিনা কে জানে সব সময় কালো উলেন স্যুট, কালো চামড়ার জুতো, কালো মোজা এবং কালো চামড়ার রিস্টওয়াচ পরে থাকেন তিনি। তাঁর শরীরে দুটো মাত্র জিনিস সাদা, তবে এ দুটোর ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত পছন্দের কোন অবকাশ নেই বলেই আজও সেগুলো যা ছিল তাই আছে। মাথার। সাদা চুল কলপ লাগিয়ে কালো করে নিয়েছেন, কিন্তু হিটলারী গোঁফ আর ঝকঝকে দাঁতগুলো ধবধবে সাদা।

প্রেসিডেন্ট গডফ্রে পিডলের শুধু মুখভঙ্গি লক্ষ করলে তাকে ভুল বোঝার অবকাশ সব সময় থেকে যায়। এই যেমন এখন। আমার দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি, চোখমুখ বিকৃত করে চৈচাচ্ছেন, হাত পা ছুঁড়ে নাচানাচি করছেন চারপাশে-যেন মারধর শুরু করবেন তিনি এখুনি। কিন্তু তাকে বুঝতে হলে তার। বক্তব্য শুনতে হবে। তিনি উত্তেজনায় লাফাচ্ছেন আর বলছেন, মিস্টার রানা, তুমি আমাদের গর্ব। তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাই। দ্বীপবাসীদের পক্ষ থেকে তোমাকে আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, এবং... শেষের এই কথাটা সুযোগ পেলেই পুনরাবৃত্তি করেন তিনি, ...এবং সেন্ট মেরী দ্বীপের একজন সাক্ষা নাগরিক হিসেবে তোমাকে পেতে যাচ্ছি বলে আমরা গর্বিত। কেন যেন আমাকে তার খুব পছন্দ হয়েছে-সেই প্রথম দিন থেকেই। জাতীয় উৎসবে বা কোন অতিথির আগমনে যখনই গভর্নমেন্ট হাউজে কোন রাজকীয় খানাপিনার আয়োজন হয়, আমাকে নিমন্ত্রণ করতে কখনও তার ভুল হয় না।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ছবি তোলার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এল চ্যাণ্ডা গোথলে রামাদীন। মাস্কাতা আমলের ক্যামেরাটা তে-পায়ার উপর বসিয়ে কালো কাপড়ের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। বিশাল শিকারের পাশে দাঁড়ালাম আমরা। মাঝখানে টনি রুমার, হাতে রড নিয়ে। তাকে ঘিরে বাকি সবাই দাঁড়াল। আমার পাশে দাঁড়িয়েছে রডরিক, আরেক পাশে ল্যাম্পনি। ল্যাম্পনিকে প্রায় ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে আমার পাশে চলে এলেন প্রেসিডেন্ট গডফ্রে পিডল। দাঁত বের করে তার সাথে হাসছে সবাই। কিন্তু রডরিক তার বিশাল দুই কাঁধের উপর বসানো প্রকাণ্ড মুখটাকে কৃত্রিম আতঙ্কে বিকৃত করে তুলেছে, চোখ দুটো বিস্ফারিততাকিয়ে আছে লেন্সের দিকে। চার্টার পার্টিদের মুগ্ধ করার জন্যে এ ছবি আগামী মওসুমে অবদান রাখবে সন্দেহ নেই। দর্শনীয় চেহারার ক্রু, বিশাল শিকার, খোদ প্রেসিডেন্ট এবং চার্টার পার্টিকে নিয়ে তরুণ স্কিপারকে ফটোতে দেখে শিকার বিলাসী সৌখিন পার্টিরা প্রলুব্ধ হবে। অন্তত স্কিপারের ক্যাপের নিচে এবং বোতাম খোলা শার্টের ভিতর থেকে বাকা হয়ে

বেরিয়ে আসা চুল আর উঁচু হয়ে থাকা পেশী, তার সাথে গর্বিত হাসিটুকু-একবার দেখলে ভুলতে পারবে না কেউ। এইসব ভাবছি তখন আমি।

পাইনঅ্যাপেল এক্সপোর্ট শেডের কোল্ডস্টোরেজে মাছটাকে আপাতত রাখার ব্যবস্থা হল। পরবর্তী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শিপমেন্টে লগুনের রোল্যাণ্ড ওয়ার্ডে পাঠানো হবে এটাকে। ল্যাম্পনি আর রডরিককে জলকুমারীর ডেক পরিষ্কার করার কাজে লাগিয়ে দিয়ে রুমারকে নিয়ে রওনা দিলাম আমি। কাজটা শেষ করে হারবারের শেষ মাথার কাছে শেল বেসিনে নিয়ে গিয়ে জলকুমারীতে তেল ভরবে ওরা, তারপর বন্দর থেকে খানিক দূরে নোঙর ফেলবে।

আমার পুরানো রঙচটা ফোর্ড পিকআপে রুমারকে নিয়ে উঠলাম। স্টার্ট দিতে যাব, এমন সময় দেখি মাটি কাঁপিয়ে কালো একটা ঝড় ছুটে আসছে আমাদের দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ির পাশে এসে থামল রডরিক। প্রকাণ্ড মাথাটা জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে কানে ঠোঁট ছুঁয়ে নিচু গলায় বলল সে, বোনাসের কথাটা ভুলে গেছি, রানা! আমি বলতে চাই, মানে...তুমি তো জানোই,

জানি, বললাম। বেগম রডরিককে বোনাসের কথাটা জানানো চলবে না, এই তো? এর জন্যে ছুটে না আসলেও চলত তোমার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রতিবারের মত উত্তর দিল রডরিক। না জানালে ভাল হয়, এই আর কি! যমের মত ভয় করে সে স্ত্রীকে।

ঠিক আছে বাবা, এখন তুমি যাও, কাজ করগে।

পরদিন সকালে টনি রুমারকে প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম। মালভূমি থেকে নামার সময় সারাটা রাস্তায় গলা ছেড়ে গান। গাইছি, ফোর্ড পিকআপের বিচিত্র হর্ন বাজিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দ্বীপবাসী মেয়েদের। পাইন অ্যাপেলের মাঠে কাজ করছে তারা। পরিচিত পিপ পিপ পিপ, পিপ-পিপ পিপ্ কানে যেতেই সিধে হয়ে। তাকাচ্ছে সবাই, চওড়া ষ্ট্র হ্যাটের কার্নিসের নিচে হাসিতে। উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে চেহারাগুলো, হাত নাড়ছে তারা।

রামাদীনস ট্র্যাভেল এজেন্সিতে এসে রুমারের আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্রাভেলার্স চেকটা ভাঙলাম। বরাবরের মত এবারও বিনিময়ের হার নিয়ে দরকষাকষি করতে হল রামাদীনের সাথে। ঢাণ্ডা রামাদীনের শরীরের কোথাও মাংসের কোন খবর নেই, তালগাছের মত ছয় ফুট লম্বা সে। উদ্যোগী পুরুষ, সম্ভাব্য সব ব্যবসার সাথে জড়িত রাখে নিজেকে। লোকটা ভারতীয়, ব্যবসা করতে এসে চিরস্থায়ী হয়ে গেছে দ্বীপে। যখন ঢুকলাম দেখি চামড়ার ব্যাগ হাতে রোগী দেখতে যাবার তোড়জোড় করছে সে। ক্যামেরাম্যান এখন কবিরাজের ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে।

গত তিন বছর ধরে রামাদীনই সমস্ত চার্টার পার্টি জোগাড় করে দিচ্ছে আমাকে। প্রতিবারের মত ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে দশ পার্সেন্ট কেটে নিল সে। দ্বীপের একমাত্র ইনশিওরেন্স এজেন্সির মালিকও সে, এই সুযোগে জলকুমারীর বীমা বাবদ বাৎসরিক প্রিমিয়ামের টাকাটাও কেটে নিতে ভুল করল না। মোট তিনবার গুণে বাকি টাকা ফেরত দিল আমাকে। স্টীল রিমের চশমা পরা লোকটাকে নিরীহ, ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে বলে মনে হলেও বই-পুস্তকে যত রকম ছলচাতুরীর কথা লেখা আছে তার সবগুলো জানা আছে তার, অতিরিক্ত আরও দু'একটার কথা জানে সে যেগুলো এখনও লেখা হয়নি কোথাও। তাই সতর্কতার সাথে নিজেও একবার গুনলাম টাকাগুলো।

চোখেমুখে পিতৃসুলভ স্নেহ ভাব ফুটিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে রামাদীন। আমি টাকা গণনা শেষ করতেই মৃদু উপদেশের সুরে স্মরণ করিয়ে দিল সে, কাল আরেকটা চার্টার পার্টি আসছে, মনে আছে তো, মিস্টার?

আছে, বললাম আমি। চিন্তা করবেন না, আমার কুরা সবাই সুস্থ থাকবে।

এরই মধ্যে লর্ড নেলসনে পৌঁছে গেছে ওরা, একটু গভীর হল রামাদীন, আমার ভাল-মন্দ সম্পর্কে কত যেন মাথাব্যথা তার! ল্যাম্পনি এরই মধ্যে পৌনে এক ডজন মেয়েকে ডেকে নিয়ে গেছে... দ্বীপের কোথায় কখন কি ঘটছে তার নিখুঁত খবর রাখে রামাদীন।

তাতে হয়েছে কি? বললাম আমি। একটু মদ খেলে বা মেয়েদের নিয়ে একটু আড্ডা মারলে কাল সকালের মধ্যেই মারা যাবে না ওরা।

কথা বাড়াবার আর সাহস হল না রামাদীনের, নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে সে। জিলেট ল্যাম্পনি আর ফিলিপ রডরিক, এই দুজন সম্পর্কে কোনরকম বিরূপ মন্তব্য সহ্য করতে পারি না আমি। দ্বীপে এমন বেশ কিছু লোকজন পাওয়া যাবে যারা ওদের। বিরুদ্ধে আমার মন বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে আমার হাতেই উত্তম-মধ্যম খেয়ে দুচারদিন করে হাসপাতালে কাটিয়ে এসেছে। এসব অজানা থাকার কথা নয় রামাদীনের।

ড্রেক স্ট্রীট পেরিয়ে এডওয়ার্ড স্টোরে এলাম। দোকানের পিছনের গলিতে লাইন দিয়ে হৈ-চৈ করছে পঁচিশ-ত্রিশটা কালো মাণিক, শুনতে পেলাম। আমাকে অভিনন্দন জানানর জন্যে মা এডি তার তিন মেয়ে এবং তাদের এক ডজন বান্ধবীদের নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে বৃদ্ধা নিজে বেরিয়ে এল কাউন্টারের এপারে। মাথার পিছনে হাত দিয়ে টেনে নিল নিজের বিশাল দুই স্তনের মাঝখানে। কোমল মাংসে নাক ডুবে গেল আমার, দম আটকে এল। তারপর ছেড়ে দিয়ে বুড়ি সহাস্যে জানাল, মেয়েদের হাত ধরে তোর মাছ দেখতে গিয়েছিলাম। হাত ধরে দরজার কাছ থেকে কাউন্টারের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা টুলে বসিয়ে দিল আমাকে। শেলী, বাছাকে ঠাণ্ডা এক ক্যান বিয়ার দাও জলদি।

ইয়েস, মিসাস! কর্মচারী মেয়েটা লাফ দিয়ে ছুটল।

মানিব্যাগ থেকে টাকার বাগ্গিল বের করলাম আমি। এক ঝাঁক মুরগীর বাচ্চার মত কিচির মিচির করে উঠল মেয়েরা। চোখ। বিস্ফারিত করে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মা এডি। দুহাতে টাকা কামাও, বাবা। দিনে দিনে উন্নতি কর তুমি... আশীর্বাদ করছে বুড়ি।

দোকানের পিছনের গলি থেকে টু-শব্দটি আসছে না এখন আর। কালো মাণিকের দল কিভাবে যেন টের পেয়ে গেছে আমার উপস্থিতি।

কত পাওনা হয়েছে, মিসাস এড? জুন থেকে নভেম্বর, এই ছয় মাস মাছ পাওয়া যায় না, ফলে এক পয়সা রোজগার করি না আমি-এই বিপদের সময়টা যখন যা দরকার হয় সব বাকিতে দিয়ে সাহায্য করে আমাকে মা এডি।

হিসাবের খাতাটা টেনে নিয়ে যোগফলটা শুধু দেখলাম, তার নিচে ত্রিশ জোড়া রাবারের জুতো, সুতি কাপড়ের শার্ট ও হাফ প্যান্ট এবং ত্রিশ প্যাকেট চকলেটের দাম লিখে মোট পাওনা যা দাঁড়াল তার চেয়ে কিছু বেশি টাকা জমা রাখলাম।

বাজারের ক্যান হাতে শেলফের দিকে তাকিয়ে জিনিসপত্র বাছাই করছি, মই বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে মেয়েরা সেগুলো পেড়ে আনার জন্যে। মিনি স্কার্ট পরা নিগ্রো মেয়েদের পা আর মাংসল উরু বারবার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে...থুড়ি!

দ্বীপের তৈরি সরু একটা চুরুট ধরিয়ে মা এডির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বেরিয়ে আসার সময় শুনতে পেলাম অদম্য খুশি আর আনন্দে আবার চাঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে কালো মাণিকের দল। সোজা শেল কোম্পানি বেসিনে এসে ম্যানেজারের সাথে দেখা করলাম। বিশাল সব সিলভার ফুয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্কের মাঝখানে তার অফিস।

মি. রানা, আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ম্যানেজার। বসুন। সকাল থেকে অপেক্ষা করছি আপনার জন্যে। আপনার বিলের ব্যাপারে হেড অফিস এমন কান্নাকাটি শুরু করেছে...

এবার ওদেরকে হাসতে বলুন, জলকুমারীর ফুয়েল বাবদ সব পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বললাম। কিন্তু জলকুমারী সুন্দরী নারীর মতই, বড় বেশি খরচ ওর পেছনে-শেল কোম্পানি থেকে বেরিয়ে এসে পিকআপে ওঠার সময় পকেটটা অনেক হালকা মনে হল আমার।

লর্ড নেলসনের বিয়ার গার্ডেনে অপেক্ষা করছে ওরা। ব্রিটিশ। রয়্যাল নেভির ক্রু এবং অফিসারদের জন্যেই বিশেষ করে চালু করা হয়েছিল এই বার অ্যাণ্ড রেস্টোরা। তখন এখানে স্থানীয় দ্বীপবাসীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। দ্বীপটা স্বাধীন হওয়ার পর। বদলে গেছে সবকিছু। কিন্তু দুশো বছরের ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও ব্রিটিশ ফ্লীটের একটা স্টেশন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেন্ট মেরী। রয়্যাল নেভি তাদের স্টেশন প্রত্যাহার করেনি বলে দ্বীপবাসীরা গর্বিত। গ্র্যাণ্ড হারবারে প্রতিদিনই। দুএকটা যুদ্ধ জাহাজ, রসদবাহী জাহাজ এবং ফুয়েল ট্যাঙ্কার। নোঙর ফেলছে। সেই সাথে আনাগোনা করছে নানান দেশের বাণিজ্যিক জাহাজ, গভীর মসুদ্রে চলছে চোরাকারবারীদের মহোৎসব। এবং এসপিওনাজের জটিল নেটওয়ার্ক।

হারবারের উপরে হেডল্যাণ্ডে কংক্রিটের তৈরি হিলটনের চেয়ে লর্ড নেলসনে আড্ডা মেরে অনেক বেশি আনন্দ পাই আমি। ছায়া সুশীতল বাগানে বসে যতই হুল্লোড় কর, গান ধর, মদ খাও-কেউ তাকিয়েও দেখে না। অবশ্য রাত যখন গভীর হয়, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হিলটনে প্রায়ই যেতে হয় আমাকে।

বাগানের পাচিল ঘেঁষে একটা বেঞ্চিতে গা ঠেকিয়ে বসে আছে বেগমকে নিয়ে রডরিক। দুজনেই আজ তাদের বিয়ের পুরানো পোশাক পরে এসেছে। শুধু এই পোশাক যখন পরে ওরা তখনই দুজনকে আলাদা ভাবে সহজে চিনতে পারা যায়। রডরিকের থ্রিপীস সুইচের একটা বোতাম নেই, বাকিগুলোর কিনারা ভেঙে গেছে। তার মাথার উপ-সী ক্যাপটা শুকনো রক্ত আর স্বচ্ছ লবণের গুঁড়োয় নোংরা হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই। বেগম রডরিকের পরনে আজানুলম্বিত ভারী কালো, উলের পোশাক, কালের ছোঁয়ায় রঙ সবুজ হয়ে এসেছে, পায়ে গোড়ালি ঢাকা বোতাম আঁটা চামড়ার ভারী জুতো। এই পোশাক ছাড়া চেহারা, ওজন, শারীরিক কাঠামো এবং রঙ কোথাও দুজনের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে সব সময় ক্লিন শেভ হয়ে থাকে রডরিক, কিন্তু বেগমের নাকের নিচে গোঁফের পাতলা রেখাটা কারও চোখে না পড়ে উপায় নেই।

হ্যালো, মিসাস রডরিক, কেমন আছ? বললাম আমি।

থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার রানা, সংক্ষেপে বলল বেগম রডরিক। ছেলেমানুষকে লাই দিলে মাথায় চড়ে বসবে, তাছাড়া আমি যেহেতু একাধারে তার স্বামীর বস্ এবং বন্ধু, তাই খুব কম কথা বলে সে আমার সাথে। তার একমাত্র দুশ্চিন্তা স্বামীর পাওনা টাকাটা আমার কাছ থেকে উদ্ধার করে কিভাবে কোথায় লুকিয়ে রাখবে। এ ব্যাপারে তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতা দিই আমি। জানি, বউ যদি একটু ঢিল দেয় সব টাকা মদ খেয়ে ওড়াবে রডরিক।

বল, কি আনাব তোমার জন্যে, জানতে চাইলাম।

সামান্য একটু অরেঞ্জ জিন হলেই চলবে, মিস্টার রানা।

চুপ করে বসে আছে রডরিক, স্থির উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে আছে তার পেশী। আমার হাত থেকে টাকা নিয়ে গুনছে বেগম, নিঃশব্দে নড়ছে তার পুরু ঠোঁট জোড়া। আমার সাথে চোখাচোখি হতে

ঢোক গিলল রডরিক, আবেদনের দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে। আজ আবার সবিস্ময়ে ভাবলাম, বউ এত সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধরে কিভাবে রডরিক তাকে বোনাসের টাকাটা ফাঁকি দিচ্ছে। ব্যাপারটা বেগমের তরফ থেকে ইচ্ছাকৃত প্রশ্ন নয় তো!

গোঁফ ভিজিয়ে গ্লাসে শেষ চুমুক দিল বেগম রডরিক, বহু কষ্টে বিশাল শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, এবার তাহলে আমি আসি, মিস্টার রানা। আবার দেখা হবে।

বাগান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে থপ থপ পায়ের শব্দ তুলে বেগম। রডরিক, বয়-বেয়ারারা সসম্মত সবে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে তাকে। অন্য কোন কারণে নয়, তার প্রকাণ্ড শরীরটাই সম্মান কেড়ে নেয় মানুষের। বেগম অদৃশ্য হয়ে যেতেই টেবিলের তলা দিয়ে বোনাসের টাকাটা রডরিককে দিলাম আমি। খুশিতে ঝকঝক করে উঠল দৈত্যের দুচোখ। দুজন একসাথে চললাম প্রাইভেট বারের দিকে।

দুপাশে দুজন এবং কোলের উপর একটি মেয়েকে নিয়ে বসে আছে জিলেট ল্যাম্পনি। নাভির কাছে বেল্ট পর্যন্ত খোলা টকটকে লাল সিল্কের শার্ট পরে আছে সে, বুকের চকচকে পেশী দেখা যাচ্ছে তার। টাইট ফিটিং প্যান্টটা কামড়ে ধরে আছে। শরীরের চামড়া, তার যে পুরুষাঙ্গ আছে সে-ব্যাপারে কারও কোন। সন্দেহের অবকাশ রাখেনি। পায়ের বুট জোড়া সদ্য পালিশ করা, আয়নার মত ঝকঝক করছে। উদার হস্তে নারকেল তেল ঢেলেছে। মাথায়, তারপর ব্যাকব্রাশ করেছে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চের মত উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে গোটা কামরা উদ্ভাসিত করে রেখেছে সে। আমি তাকে তার পাওনা মিটিয়ে দিতেই প্রত্যেক মেয়ের ব্লাউজের সামনের দিকে একটা করে ব্যাল্ক নোট পিন দিয়ে আটকে দিল সে।

হেই, লিজা, ব্যস্ততার সাথে বলল সে, কানী, দেখতে পাচ্ছিঁস না, শালা মনিব এসে হাজির হয়েছে! যাও ছুকরী, বসের কোলে গিয়ে আস্তানা গাড়ো, ওকে খুশি করো। কিন্তু সাবধান! বস্ শালা এখনও একটা ভার্জিন, বুঝে-সমঝে নাড়াচাড়া করবি ওকে, বুঝলি! হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ করে হাসতে শুরু করল সে, তারপর ফিরল রডরিকের দিকে। অ্যাই শালা, রডরিক, তোর এই ফিক ফিক হাসি থামালি তুই!

হাসছিল তো না-ই, ভুরু আরও কুঁচকে গিয়ে চারপাশের ফুলে। ওঠা মাংসে চোখ দুটো প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল রডরিকের। মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে চেহারাটা এক নিমেষে ঠিক বুলডগের মত কদাকার এবং বীভৎস হয়ে উঠল।

উফ! ভয়ে মরে যাই! তাচ্ছিল্যের সাথে মুখ ভেঙচাল ওকে ল্যাম্পনি। ওই বুলডগ সেজেই থাক, আমার গায়ে হাত তুলবিসে-সাহস তোর কোনদিনই হবে না। রানা যতক্ষণ...

মাসুদ যখন না থাকে? কর্কশ গলায় দ্রুত জানতে চাইল রডরিক।

জোকের মুখে লবণ পড়ল যেন, নিমেষে শান্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করল ল্যাম্পনি। হ্যাঁ, তখনকার কথা আলাদা।

এখন তাহলে আয় মদ খেয়ে হুল্লোড় করি?

উত্তম প্রস্তাব, গম্ভীর ভাবে বলল ল্যাম্পনি। এই প্রথম সরাসরি তাকাল আমার দিকে। আন্তরিক সমীহের সাথে জানতে চাইল, তুমি কি বলো, শালা বস?

ভুরু কুঁচকে চিন্তাবিহীন ভঙ্গিতে বললাম, মদ? হ্যাঁ, তা তো খেতেই হবে। মদ খেতে না পারলে আজ আমি মরেই যাব।

ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল বারম্যান। কাউন্টারে ট্রে সাজানো হয়ে গেছে অনেক আগেই। তার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে বেয়ারা ছুটোছুটি করে পরিবেশন শুরু করল।

বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দেদার চালিয়ে গেলাম আমরা।

কেউ কারও চেয়ে কম খাইনি, কিন্তু তিনজনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে তিন রকম। টেবিলের উপর উঠে পদ্মাসনে বসে গেছে ল্যাম্পনি, সামনে মদের গ্লাস, তার পাশে ফেলে রেখেছে ক্ষুরের মত ধারালো বেইট নাইফটা, মাথা নিচু করে বিড় বিড় করে প্রলাপ বকছে। খানিক পর পরই বুড়ো আঙুল দিয়ে

ছুরির ধার পরীক্ষা করছে সে, তারপর ঝট করে মুখ তুলে আক্রমণাত্মক, হিংস্র ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে কামরার চারদিকে। দেখছে, কেউ তার দিকে কোন নজর দিচ্ছে কি না।

আমার পাশের একটা চেয়ারে বসে আছে রডরিক। চুপচাপ হাসছে সে। ঝকঝকে সাদা দাঁত আর গোলাপী রঙের মাড়ি দেখা যাচ্ছে তার।

সরু চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছি আমি, ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করছি দুজনকে।

মাসুদ, মুখটা আমার মুখের কাছে সরিয়ে এনে চোখে চোখ। রাখল রডরিক। ঢুলু ঢুলু চোখ দুটো নিমেষে স্বাভাবিক হয়ে এল তার। নেশার চিহ্নমাত্র নেই এখন তার দৃষ্টিতে। ব্যাকুল ভাবে কি যেন খুঁজছে সে আমার চোখে। দশ সের ওজনের পেশীবহুল একটা হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। ইউ আর এ গুড বয়, মাসুদ। একটা কথা বলব বলব করে কক্ষনো কোনও দিন তোমাকে বলা হয়নি। একটু থেমে নিজেকে গুছিয়ে নিল রডরিক। অদ্ভুত একটা মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার চোখে। প্রত্যেক বেতনের দিন এই কথাটা বলে সে আমাকে। মাসুদ, আই লাভ ইউ, ম্যান। আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসি আমি তোমাকে!

শুকনো রক্ত আর লবণের গুঁড়ো মাখা নোংরা ক্যাপটা তুলে রডরিকের খয়েরী রঙের কামানো মাথার গম্বুজে ছোট্ট একটা চাটি দিলাম আমি। বরাবর যা বলে থাকি তাই বললাম, আমিও।

মুখটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পাঁচ সেকেন্ড ধরে ভাল করে। নিরীক্ষণ করল আমাকে রডরিক, সত্যি বলছি কিনা বোঝার চেষ্টা করছে যেন। ধীরে ধীরে দুই কানে গিয়ে ঠেকল হাসি। অর্থাৎ, বিশ্বাস করে ও আমাকে।

আরও দুই পেগের অর্ডার দিলাম, এই সময় বারে ঢুকল গোথলে রামাদীন। সরাসরি এগিয়ে এসে আমাদের টেবিলে বসল সে। স্টীল রিমের চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে ফ্রেমের উপর দিয়ে আমার দিকে তাকাল। হাসলাম। বলল, মিস্টার রানা, লগুন থেকে এইমাত্র জরুরী একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি আমি। আপনার চার্টার বাতিল হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে হাসিটা মুছে গেল আমার মুখ থেকে। দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল মনটা। গোটা মওসুমে একটামাত্র পার্টি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে নাকি? পকেটে বড় জোর আর তিনশো ডলার আছে, সারাটা বছর চলব কিভাবে? এই এলাকার দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মেজর জেনারেল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন খরচের টাকা সব আমাকেই জোগাড় করে নিতে হবে। ক্যামোফ্লেজের নিরাপত্তার জন্যেই প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনরকম ব্যক্তিগত আদানপ্রদান বা যোগাযোগ করা চলবে না। হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়্যারলেস সেটটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে শুধুমাত্র অফিশিয়াল ইনফরমেশন পাঠানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে।

যেভাবে হোক নতুন একটা পার্টি ধরুন, বললাম আমি।

ছুরিটা তুলে নিয়ে ঘাঁচ করে টেবিলের উপর গাঁথল সেটা ল্যাম্পনি। কেউ তার দিকে কোন খেয়াল দিল না। আবার সে হিংস্র ভঙ্গিতে কামরার চারদিকে তাকাচ্ছে।

হে, হে-, সবিনয়ে হাসল রামাদীন। তারপর বলল, আমার তরফ থেকে চেষ্টার ক্রটি হবে না। কিন্তু বোঝেনই তো, মওসুম প্রায় শেষ হতে চলেছে কিনা...

যাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাদের টেলিগ্রাম করুন, বললাম ওকে।

কালক্ষেপ না করে দ্রুত জানতে চাইল রামাদীন, টেলিগ্রামের টাকাটা কে দেবে?

চোখ গরম করে রামাদীনের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠে চেয়ারের পিঠের সাথে সঁটে গেল হাড়সর্বস্ব লোকটা। ঠিক আছে, বললাম, আমিই দেব।

হে-হে করে হেসে দ্রুত কেটে পড়ল রামাদীন। মন খারাপ কোরো না, চোখ মটকে বলল রডরিক। স্টিল আই লাভ ইউ, ম্যান।

পিছু হটে ধপ করে আমার পাশের চেয়ারে পড়ল ল্যাম্পনি। ব্যাপারটা লক্ষ করে ব্যস্ত হাতে টেবিল থেকে বোতল আর গ্লাসগুলো একপাশে সরিয়ে নিল রডরিক। ধন্যবাদ, ঢুলু ঢুলু চোখে রডরিকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ল্যাম্পনি, তারপর টেবিলে মাথা নামিয়ে চোখ বুজল সে, এবং সাথে সাথে

ঘুমিয়ে পড়ল। চারদিক থেকে শকুনির মত এগিয়ে আসছে মেয়েরা, তাই দেখে ল্যাম্পনির পকেট থেকে বেতনের টাকাটা বের করে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলাম আমি।

আরেক প্রস্থ মদের অর্ডার দিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় একটা গান ধরল রডরিক। পিঠ, কোমর, কাঁধ, মাথা-সুরের সাথে বিচিত্র বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে আন্দোলিত হচ্ছে। এদিকে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছি আমি।

পার্টি পাওয়া না গেলে আবার বোট নিয়ে নাইট ডিউটিতে যেতে হবে আমাকে। প্রথম দিকে চোরাচালানের এই ঝুঁকিবহুল পথে ইনফরমেশন জোগাড়ের আশায় যেতে হত। উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্যে তালে তাল মিলিয়ে কিছু ব্যবসাও করতে হত আমাকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কাজ হাসিলের পদ্ধতি পানির মত সহজ করে নিয়েছিলাম আমি। এখন আর নিশ্চিতি রাতে নাইট ডিউটিতে গিয়ে ইনফরমেশন সংগ্রহ করতে হয় না, এই দ্বীপে বসেই কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে সব জানতে পাবার নিখুঁত ব্যবস্থা করে নিয়েছি। এতে অবশ্য কিছু খরচ হয়, কিন্তু নির্ভেজাল এবং গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনের তুলনায় তা খুবই নগণ্য।

পার্টি পাওয়া না গেলে তাই যাব, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিয়ে মনটাকে শান্ত করলাম। মাসুদ রানা নাইট ডিউটিতে যেতে চায়, কথাটা তাহলে প্রচার করে দিতে হবে আগ্রহী লোকদের মধ্যে।

আরও একটা চুরুট ধরিয়ে রডরিকের সাথে গান ধরলাম। কিন্তু একটু পর সন্দেহ হল দুজনে একই গান গাইছি কিনা। প্রতিটি বিরতিতে রডরিকের আগেই পৌঁছে যাচ্ছি আমি।

সম্ভবত দ্বৈত-সঙ্গীতের মধুর আকর্ষণেই বারে এসে চুকল স্বয়ং আইন। সেন্ট মেরীতে আইন বলতে বোঝায় একজন ইন্সপেক্টর এবং চারজন টুপার। দ্বীপের প্রয়োজনের তুলনায় বাহিনীটাকে বড়ই বলতে হবে। গত তিন বছর বউ-পিটুনির কদাচ দুএকটা ঘটনা ছাড়া আর কোন অপরাধ আজ পর্যন্ত ঘটেনি।

ইন্সপেক্টর পিটার টালি একজন ব্রিটিশ, আরও পাঁচ বছরের চুক্তিতে দ্বীপের পুলিশ বাহিনী প্রধানের চাকরিতে রয়ে গেছে। আগামী বছর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে তার। দ্বীপের নাগরিক সাব-ইন্সপেক্টরকে সবাই ইন্সপেক্টর হিসেবে চায়, তাই পিটার টালির চুক্তির মেয়াদ বাড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সেটা

বুঝতে পেরেই সম্ভবত গোলমাল আর অপরাধের গন্ধ খুঁজে বেড়ায় সে ডালকুত্তার মত, এবং কোথাও তেমন কিছু ঘটতে দেখলে কড়া শাসনের স্বাক্ষর রাখার চেষ্টা করে, যাতে সে চলে যাবার পরও দ্বীপবাসীরা সহজে তাকে ভুলে যেতে না পারে।

ইন্সপেক্টর পিটার টালির মুখটা লাল, ঠোঁটের উপর কালো রঙের চিকন গোঁফ, পরনে গাঢ় সবুজ রঙের ইউনিফর্ম। সিলভারের ব্যাজ লাগানো ক্যাপের কার্নিসটা অস্বাভাবিক চওড়া। তার হাতের আঠারো ইঞ্চি লম্বা ছড়িটার হাতল পালিশ করা চামড়া দিয়ে মোড়া। ইউনিফর্মের গায়ে বুকের দুদিকে, দশটা করে পদক এবং মেডেল ঝুলছে। এগুলো সে পেয়েছে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে, দ্বীপে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি এই রিপোর্ট লিখে।

মি. রানা, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে অপর হাতের তালুতে ছড়ির হালকা বাড়ি মারছে ইন্সপেক্টর টালি। আমি চাই না, আজ রাতে দ্বীপে কোন গণ্ডগোলার সৃষ্টি হোক।

মি. রানা, স্যার... কিভাবে আমাকে সম্বোধন করতে হবে বলে দিলাম আমি। লোকটাকে দুচোখে দেখতে পারি না। প্রতিটি জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ঘুষ খায় সে। সুযোগ পেলে আমার কাছ থেকেও খেতে ছাড়ে না।

মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের। কিন্তু রাগ চেপে রেখে আবৃত্তি করল সে, মি. রানা, স্যার।

ইন্সপেক্টর, এখানে আমরা কেউ মারামারি করছি না, ঠিক?

হ্যাঁ...তা করছেন না।

প্রকাশ্যে মধুর কণ্ঠে গান গাওয়া অপরাধ নয়, ঠিক? আবার জানতে চাইলাম আমি।

হ্যাঁ...কিন্তু...

দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলাম টেবিলের উপর। তাহলে এখনও আপনি এখানে দাঁড়িয়ে
আছেন কেন? যান, কেটে পড়ুন...।

আমার দেখাদেখি রডরিকও টেবিলের উপর ঘুসি তুলছে দেখে তার হাত ধরে ফেললাম বাধা দিয়ে
মৃদু কণ্ঠে বললাম, এটা কারও মাথা নয়, বোকা। ভেঙে লাভ কি?

একটা গোলমাল পাকাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি আমরা, বুঝতে পেরে সাবধান হয়ে গেল
ইন্সপেক্টর টালি। কাঙাল যেভাবে তার ছেড়া কস্বল আঁকড়ে ধরে সেভাবে নিজের সম্মানটুকু আঁকড়ে
ধরে পিছিয়ে গেল সে, বলল, ঠিক আছে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার ওপর নজর রাখছি আজ
থেকে। বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, হন হন করে বেরিয়ে গেল বার থেকে।

খানিক পর দরজায় আবার গোথলে রামাদীনকে দেখে। আরেক প্রস্থ পানীয়ের অর্ডার দিল রডরিক।

মিস্টার রানা, আপনার জন্যে একটা পার্টি পেয়েছি আমি।

মিস্টার রামাদীন, বলল রডরিক, আমরা তোমাকে ভালবাসি।

কিন্তু নাইট ডিউটিতে যাবার আর দরকার হবে না বুঝতে পেরে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল
আমার। নাইট ডিউটিতে বিপদের ঝুঁকি আছে পুরোমাত্রায়, সেটুকু উপভোগ করে মজা পাই। কখন
আসছে ওরা?

এসে গেছে। অফিসে ফিরে দেখি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, বলল রামাদীন। একটা পার্টির
পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে এ-খবর জানে ওরা। আপনার নামটাও ওদের অজানা নয়।
টেলিগ্রাফের সাথে ওরা বোধহয় একই প্লেনে এসেছে।

অজ্ঞাত কারণে একটা পার্টি পিছিয়ে গেল, তার বদলে অন্য একটা পার্টি ঠিক সময়ে সরাসরি এসে
হাজির, এর মধ্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে-কিন্তু অন্যমনস্ক ছিলাম বলে এ নিয়ে কিছুই ভাবলাম না
তখন।

হিলটনে উঠেছে ওরা, বলল রামাদীন।

ওদেরকে তুলে আনতে হবে?

না। কাল সকাল দশটায় অ্যাডমিরালটিতে আপনার সাথে দেখা করবে ওরা।

তিন

ফ্লাইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে পড়েছি। চোখে গাঢ় রঙের পোলারয়েড গ্লাস, জেটির উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে ড্রেক স্ট্রীটের দিকে। অবিরাম ছল-ছল-ছলাৎ বাজছে কানে, শন্ শন্ করছে বাতাস। মাঝরাত পর্যন্ত মদ খেয়েছি, নেশার ঘোরটা পুরোপুরি কাটেনি এখনও।

ফোরডেকে দাঁড়িয়ে হাত চালিয়ে কাজ করছে ওরা, একই সাথে চলছে তুমুল ঝগড়া। দড়ির জট ছাড়িয়ে গুছিয়ে রাখছে। রডরিক, দরদর করে ঘামছে সে-ঘাম তো নয়, যেন নির্ভেজাল অ্যালকোহল বেরিয়ে আসছে তার লোমকূপ থেকে। আর একহারা চেহারার ল্যাম্পনি রড ধরে হাঁটার সময় টলছে।

বস্ শালা দ্বীপে আসতেই না তোর কপাল খুলল, রডরিককে বলছে ল্যাম্পনি। তার আগে তুই কি করতিস সবার জানা আছে। মদ খেয়ে গরুর লাদার মত যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতিস বছরের মধ্যে নয় মাস। তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য যে বস্ শালা ক্রু হিসেবে তোকে চাকরি দিল, তা নাহলে আজও তুই...

একটা হোয়েল বোট ছিল রডরিকের, আজ সেটা কোন কাজেই লাগে না, মওসুমের সময় ওই হোয়েল বোট নিয়ে মাছ শিকার করত সে। গোটা ভারত মহাসাগরে ওর মত দক্ষ শিকারী আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ। দুই মাসে যা মাছ ধরত, সারা বছরের খোরাকি আর মদের দাম উঠতে চাইত না, ধারে ডুবে থাকত সে বাকি দশটা মাস। ল্যাম্পনি বাজে কথা বলছে না, চব্বিশ ঘন্টা মদ খেয়ে টং হয়ে থাকত সে। শিকারী হিসাবে ওর নাম শুনেই ওকে আমি চাকরি দিই জলকুমারীতে। সেই থেকে রয়ে গেছে আমার সাথে।

আর তুই? হুঙ্কার ছেড়ে বলল রডরিক। ছোকরাদের হাতে মার খেয়ে তো মরেই যাচ্ছিলি! ঠিক সেই সময় মাসুদ যদি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ত, কাক শকুনের খাবার হয়ে যেতিস। তোরও চোদ্দপুরুষের ভাগ্য যে মাসুদ তোর মত একজন বখাটেকে চাকরি দিয়েছিল, তা নাহলে রঙবাজি করতে গিয়ে অ্যাদ্দিন কবে মার খেয়ে মরে যেতিস।

সাংঘাতিক ডানপিটে ছিল ল্যাম্পনি। রোগাপটকা হলে কি হবে, বেজায় সাহস ছিল ওর। হুমকি দিয়ে সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলত। ছোকরা মেয়ে পটাতে ওস্তাদ, মেয়েরা ওকে ভালও বাসে। বোধহয় ডানপিটে বলেই। আমি দ্বীপে আসার আগে কোন কাজ করত না সে, দ্বীপবাসিনী মেয়েদের নিয়ে ফুটি আর পকেট খরচের জন্যে চোখ রাঙিয়ে চাঁদা তোলা ছাড়া। চাকরির প্রস্তাব পেয়ে স্পষ্টভাবে আমাকে বলেছিল, তুমি শালা কোথাকার বোকা। মাল হে? জীবনে একটা কুটো পর্যন্ত নাড়িনি, কাজ কাকে বলে। তাই জানি না-এমন লোককে চাকরি দিতে চাও কোন্ আক্কেলে?

কিন্তু কাজ শিখে নিতে তিন মাসের বেশি সময় লাগেনি ল্যাম্পনির। এখন ও দক্ষ একজন ক্রু, যে-কোন বোট মালিক ওকে লুফে নেবে। আগের চেয়ে অনেক বদলেছে ও, কিন্তু শালা সম্বোধনটা ছাড়তে পারেনি। আমার প্রতি আন্তরিকতারই একটা বহিঃপ্রকাশ এটা, আমি যে কিছু মনে করি না এতে-সেটা আবার ঠিক বুঝতে পারে ও।

এবার তোমরা থামো, বললাম ওদেরকে। দেখতে পাচ্ছি, ড্রেক স্ট্রীট কাঁপিয়ে দ্বীপের একমাত্র ট্যাক্সিটা ছুটে আসছে এদিকে।

রাস্তার শেষ মাথায় এসে থামল ট্যাক্সি। আমার পার্টি নামছে। দুজন লোক। ভুরু কুঁচকে ভাবলাম, দুজন কেন? তিনজনের কথা বলেছিল রামাদীন।

কংক্রিটের চওড়া বাঁধের উপর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে আসছে। ওরা। রেলিং থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়ালাম আমি। তলপেটের ভিতরে মৃদু একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করছি। নেশার ভাবটা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। একজন প্রায় আমার মতই লম্বা, প্রফেশনাল অ্যাথলেটের মত সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে। মাথাটা খালি, ব্যাকব্রাশ করা ছাই রঙা চুলের মাঝখানে গোল চাকতির মত অকালে টাক পড়েছে, স্লান গোলাপী রঙের খুলি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ওজনে আমার চেয়ে কিছু বেশি হবে, তবে কোমর এবং নিতম্ব সরু। আশ্চর্য একটা হুঁশিয়ার ভাব রয়েছে লোকটার মধ্যে। দেখলেই চেনা যায় এই জাতের লোকদের। শক্তি আর ভয় দেখে এবং দেখিয়ে বেঁচে থাকার ট্রেনিং রয়েছে এর। লোকটা আইনের পক্ষে না বিপক্ষে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা, যে কোন ভদ্রলোকের জন্যে সে একটা সাংঘাতিক দুঃসংবাদ। সেন্ট মেরীর সুশান্ত পানিতে এই জাতের হিংস্র ব্যারাকুড়া আশা করিনি আমি। দ্রুত অন্য লোকটার দিকে তাকালাম। এ-ও একই জাতের, তবে এর

ধার কমে গেছে, চর্বি আর মাংস জমে ভোতা হয়ে গেছে কিনারাগুলো, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারলাম-আরও একটা দুঃসংবাদ।

বয়স্ক লোকটাই লিডার, বুঝতে পারছি। লম্বা লোকটা সম্মান দেখিয়ে এক পা পিছিয়ে আছে তার চেয়ে। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। বয়স, বেল্ট দিয়ে কষে বেঁধে ভুঁড়িটাকে দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে। পরনে দামি সুট। অনুমান করলাম গোল্ড রিঙে বসানো ডায়মণ্ডটা দুই ক্যারেটের কম হবে না। রিস্টওয়াচটাও সোনার।

জেটি ধরে এগিয়ে এসে ঠিক আমার নিচে দাঁড়াল লোকটা। মুখ তুলে দেখল। কিন্তু হাসল না। মাসুদ রানা? কর্তৃত্বের সুরে। জানতে চাইল সে।

লোকটার চুলের রেখার কাছে প্লাসটিক সার্জারীর ক্ষতটা। চিনতে পারছি আমি। তার মানে এটা তার চুরি করা চেহারা, আসল চেহারাটা লুকিয়ে ফেলেছে। তথ্যটা মনে রাখলাম। এবং মুহূর্তে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝলাম, এক পার্টি পিছিয়ে গেল, সাথে সাথে আরেকটা পার্টি এগিয়ে এল-এটা কাকতালীয় ঘটনা নয়। মগজ এবং পেশীর এই জোড়া মাণিককে কেউ পাঠিয়েছে, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। এদের ফোন এবং তারপরই একটা সাক্ষাৎ পেলে যে-কোন সাধারণ শিকারীর মারলিন শিকার করার সাধ সারা জীবনের জন্যে মিটে যাবারই কথা। ঘটেছেও হয়ত ঠিক তাই। মি. ব্ল্যাক্স? বললাম আমি। উঠে আসুন।

পরিষ্কার বুঝতে পারছি আর যাই হোক, মাছ ধরতে আসেনি এরা। এদের সাথে স্পার্টসের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

লম্বা লোকটা লাফ দিল, বেড়ালের মত নিঃশব্দে নামল ডেকের উপর। কোটের প্রান্ত বাতাসে ঝাঁপটা খেল তার, ট্রাউজারের ফুলে থাকা পকেটটা দেখে ফেললাম, বুঝলাম খালি পকেটে আসেনি এরা। আমাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একদিকের নাক টানল সে, তারপর এগিয়ে আমার ক্রুদের সামনে দাঁড়াল। চিবুক তুলে মাথাটা একপাশ থেকে আরেক পাশে নিয়ে যেতে যেতে দ্রুত চোখ বুলাল ওদের উপর।

ঠোঁট মুড়ে হেসে ক্যাপের কার্নিস ছুঁয়ে বলল ল্যাম্পনি, ওয়েলকাম, স্যার। আর বিড়বিড় করে রডরিক যা বলল তা আন্তরিক অভ্যর্থনা হলেও শোনাল ভয়ঙ্কর অভিশাপের মত।

নীরব তাক্ষিল্যের সাথে ক্রুদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল লোকটা। এগিয়ে গিয়ে ডেকে নামতে সাহায্য করল বসকে, তারপর কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করেই সোজা গিয়ে ঢুকল মেইন সেলুনে। একটু পর তাকে অনুসরণ করে ব্ল্যাঙ্কও ঢুকল সেখানে। ঠিক তার পিছনেই রয়েছি আমি।

জলকুমারীর বিলাসবহুল মেইন সেলুনে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ব্ল্যাঙ্ক। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে জোরে শ্বাস টানল সে, এয়ারকন্ডিশনের শীতলতায় ভরে নিল বুক। গদিমোড়া আরাম কেদারায় গা ছেড়ে দিয়ে বডিগার্ডের পরিচয় জানাল আমাকে, মাইক প্যানথার।

ঘাড় ফেরাল না প্যানথার, ওদের দিকে পিছন ফিরে পোর্টগুলো চেক করছে, দরজা খুলছে, অহেতুক এটা-সেটা নাড়াচাড়া করছে-তার হাত দুটো অত্যন্ত অস্থির, এটাই যেন প্রমাণ করতে চাইছে সে।

তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. প্যানথার, সুবোধ বালকের মাপ্য ফুটে উঠল আমার নিঃশব্দ হাসিতে। কিন্তু আমার দিকে এবারও তাকাল না প্যানথার, শুধু বাতাসে হাত ঝাঁপটা দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল একবার। কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না সে আমাকে।

ড্রিঙ্ক, জেন্টলমেন? কেবিনেটের দরজা খুলে জানতে চাইলাম।

একটা করে কোক নিল ওরা। আমি নিলাম জিন। তারপর গং বাঁধা সুরে শুরু করলাম, এইটুকু বলতে পারি, আমার কাছে এসে আপনারা ভুল করেননি। এই তো মাত্র গতকালই আমি প্রকাণ্ড একটা মারলিন ঝুলিয়েছি জেটিতে। বড় মাছের সমস্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, দারুণ স্পার্টস হবে...।

দশ সেকেন্ড একদৃষ্টিতে লক্ষ করল আমাকে প্যানথার, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। এর আগে কোথায় দেখেছি তোমাকে?

মানে?

দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলল প্যানথার, মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি চিনি।

অসম্ভব কি? কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। তবে সভ্য জগৎকে। আমি অনেকদিন হল ডিভোর্স করেছি।

হাসল না প্যানথার। আমার সামনের চেয়ারে ধীরে ধীরে। বসল সে। দুজনের মাঝখানে টেবিলের উপর হাত দুটো উপুড়। করে রেখে ছড়িয়ে দিল আঙুলগুলো। সেই থেকে একই দৃষ্টিতে দেখাচ্ছে আমাকে। এ বড় কঠিন পাত্র, বুঝতে পারছি আমি।

আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে, সরল হেসে বললাম। আমরা যদি মৌজাস্বিক স্রোতে মাছ ধরতে চাই, সকাল ছটার আগে হারবার ত্যাগ করতে হবে। কাল ভোরে...

আগে এই তালিকাটা মিলিয়ে দেখ, রানা, আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল ব্ল্যাক্স, তারপর বলো কি কি নেই তোমার কাছে।

ব্ল্যাক্সের হাত থেকে এক শীট ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিলাম আমি। বল পয়েন্ট দিয়ে লেখা তালিকার উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখি সবগুলো স্কুবা গিয়ার এবং স্যালভেজ ইকুইপমেন্ট। পানির নিচে থেকে কিছু উদ্ধার করতে চায় এরা, বুঝতে অসুবিধে হল না। আপনারা তাহলে মাছ ধরার ব্যাপারে আগ্রহী নন? কৃত্রিম বিস্ময়ের সাথে বললাম আমি। সৌখিন স্যালভেজ...

ভূম। শখ করে এক-আধটু তল্লাশি চালাতে এসেছি, তার বেশি কিছু না।

কিছু এসে যায় না, কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। টাকার বিনিময়ে যা করতে বলবেন করব আমরা।

তালিকার সব জিনিস তোমার আছে?

প্রায় সব আছে। কিন্তু এয়ার ব্যাগ আর অতো দড়ি নেই।

জোগাড় করো, আদেশ করল ব্ল্যাক্স।

মাথা কাত করে রাজি হলাম আমি, জানতে চাইলাম, কখন রওনা হতে চান?

কাল সকালে, আমাদের সাথে আরেকজন থাকবে।

পাঁচশো ডলার রোজ, রামাদীন নিশ্চয়ই বলেছে আপনাকে? ইকুইপমেন্টের জন্যে আলাদা ভাড়া।

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্ল্যাক্স বোঝাতে চাইল এসব তার জানা আছে। সে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিলাম তাকে।

টাকার একটু চেহারা দেখলে খুশি হতাম, মৃদু গলায় বললাম আমি।

স্থির হয়ে গেল ব্ল্যাক্স। যেন লজ্জা পেয়েছি, এই ভঙ্গিতে বললাম তাকে মওসুমটা তেমন সুবিধে হয়নি, তাই হাত খালি। অনেক কিছু কেনাকাটা করতে হবে, ফ্যুয়েল ট্যাঙ্কগুলো ভরতে হবে...

নিঃশব্দে মানিব্যাগ বের করল ব্ল্যাক্স। পাঁচ পাউণ্ডের ষাটটা নোট গুনে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। বলল, তোমার কুরা আমাদের সাথে যাচ্ছে না, রানা। বোট চালাতে আমরা তিনজন সাহায্য করব তোমাকে।

চমকে উঠলাম। এটা আশা করিনি আমি। কিন্তু সাথে না নিলেও পারিশ্রমিক দিতে হবে ওদেরকে।

এইবার কথা বলল মাইক প্যানথার। আমার দিকে ঝুঁকে এল সে, বলল, বসের কথা তোমার কানে গেছে, রানা। বজ্জাত নিগ্রোগুলোকে কাল সকালে এই বোটে যেন দেখতে না পাই।

পাঁচ পাউণ্ড নোটের বাণ্ডিলটা সাবধানে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে বোতাম লাগিয়ে দিলাম আমি, তারপর মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। এই প্রথম তার ঠাণ্ডা, স্থির চোখে একটা ভাব দেখতে পাচ্ছি- পরিস্কার প্রশংসার ভাব। নিজে সে সম্পূর্ণ তৈরি, এবং বুঝতে পেরেছে ওর বেয়াড়া আচরণের পাল্টা জবাব দেবার জন্যে আমিও তৈরি হয়ে গেছি। আমাকে এক হাত দেখিয়ে দিতে চাইছে ও, যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নাক-মুখ খেঁতলে দিয়ে সুখ পেতে চাইছে। টেবিলের উপর এখনও ফেলে রেখেছে হাত দুটো, তালু দুটো নিচের দিকে, আঙুলগুলো ছড়ানো। অনায়াসে ওর সবকটা আঙুল এখনি আমি

মাঝখান থেকে মটমট করে ভেঙে দিতে পারি, সতর্ক হবার কোন সুযোগই পাবে না ও। বোটের মতই প্রাণাধিক প্রিয় আমার কুরা। শুধু কর্মচারী নয়, ওদেরকে আমি বন্ধুর মর্যাদা দিই। কেউ ওদেরকে অপমান করে আজ পর্যন্ত রেহাই পায়নি আমার হাত থেকে। কিন্তু প্যানথারকে রেহাই দিলাম। ইচ্ছে করলেই আমি পশু করে দিতে পারি ওকে বুঝতে পেরে মনটা আমার খুশি হয়ে উঠল।

অ্যাঁ হোকরা, আমি কি বললাম কানে গেছে? হিস হিস। করে উঠল প্যানথার।

ওকে শায়েস্তা করার অনেক সময় পাওয়া যাবে, তার আগে ওদের উদ্দেশ্যটা জানতে হবে আমাকে, এই ভেবে মুখে টাঙিয়ে নিলাম কাপুরুষের আপোসমূলক হাসি। জেঁ আজে, স্যার। আপনাদের টাকায় নাচব আমি।

নিজের চেয়ারে হেলান দিল প্যানথার। খুশি হয়নি সে। নিরাশার ছায়া দেখলাম ওর চেহায়ায়। ও একটা শক্তি, এবং নিজেকে খাটানতেই ওর যত আনন্দ।

নিঃশব্দে আমাদেরকে লক্ষ করছে ব্ল্যাক্স। কোন ভাব নেই তার চেহায়ায়। এই মুহূর্তে কেউ খুন হয়ে গেলেও যেন ভাবের কোন। পরিবর্তন ঘটবে না সেখানে। আপাতত সংঘর্ষ বাধেনি দেখে। একটু নড়ে উঠল সে, তারপর আবার সেই নরম গলায় বলল, তাহলে সেই কথাই রইল। সব সরঞ্জাম নিয়ে কাল আটটায় অপেক্ষা করবে তুমি আমাদের জন্যে।

চলে গেল ওরা। বসে বসে জিনটুকু শেষ করলাম আমি। এই চার্টার পার্টি সম্পর্কে মেজাজ বিগড়ে গেছে আমার। রডরিক এবং ল্যাম্পনিকে না হয় এর মধ্যে না-ই জড়ালাম, ভাবতে ভাবতে মেইন সেলুন থেকে বেরিয়ে এলাম।

কোন একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে ওদের, বললাম ওদেরকে, তোমাদেরকে বোটে নিতে চাইছে না।

যা ভাল বোঝো করো, কাজ থেকে মুখ না তুলে বলল রডরিক।

রিচার্জিংয়ের জন্যে ইঞ্জিনরুমে গিয়ে অ্যাকুয়াল্যাণ্ড বটলগুলো এয়ার কমপ্রেসারে বসালাম আমি। জলকুমারীকে জেটিতে রেখে নেমে এলাম সবাই। আমার তৈরি এয়ার ব্যাগের ড্রয়িং নিয়ে ওরা চলে গেল ল্যাম্পনির বাপের ওয়র্কশপে। আর আমি গেলাম মা এডির দোকানে।

চারটের দিকে এয়ার ব্যাগগুলো ডেলিভারি নিয়ে ককপিট সিটের নিচে মেইন লকারে রেখে দিলাম। এরপর একটি ঘন্টা ধরে স্কুবার ডিম্যাণ্ড ভার্ড এবং অন্যান্য ডাইভিং সরঞ্জাম পরীক্ষা করলাম। সূর্যাস্তের সময় আমি একাই জলকুমারীকে নিয়ে গিয়ে নোঙর করলাম, এবং বৈঠা চালিয়ে তীরে ফিরে আসার জন্যে ডিঙি নৌকায় চড়তে যাবার ঠিক আগে একটা ভাল বুদ্ধি এল আমার মাথায়। কেবিনে ফিরে এসে ইঞ্জিনরুম হ্যাচটা সরালাম আমি, লুকানো জায়গা থেকে এফ-এন কারবাইনটা বের করে ব্রীচে একটা কার্টিজ ঢোকালাম। সিলিংয়ে আবার রেখে দেবার আগে রাইফেলটাকে অটোমেটিক ফায়ারে সেট করে সেফটি ক্যাচ অন করে রাখলাম।

সন্ধ্যা নামতে একটু দেরি আছে এখনও। আমার পুরানো কাষ্ট নেট (ঝাঁকি জাল) টা নিয়ে খাড়ির উপর দিয়ে সন্তর্পণে এগোচ্ছি মেইন রীফের দিকে। রঙিন ঘূর্ণিটা দূর থেকেই চোখে পড়ল। দ্রুত চক্কর মেরে নেমে যাচ্ছে পানি, শেষ মুহূর্তের রোদ গর্তের গায়ে উজ্জ্বল তামাটে এবং আগুনের রঙ ফুটিয়ে তুলেছে। কাঁধ এবং হাত ঝাঁকিয়ে জালটাকে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলাম উপর দিকে। প্যারাসুটের মত ফুলে গেল সেটা, বড় একটা বৃত্ত হয়ে পড়ল ঝাঁক বাধা মুলিটের উপর। লাইন টেনে জাল গুটিয়ে নিয়ে দেখলাম এক হাত লম্বা পাঁচটা রূপালী মাছ কর্কশ ভিজে ভাঁজের ভিতর তড়পাচ্ছে।

দুটো মাছ গ্রিল করে আস্তানার বারান্দায় বসে খেলাম। পাহাড়ী ঝর্নার ট্রাউট-এর চেয়ে অনেক বেশি স্বাদ এগুলোর। খাওয়া শেষ করে গ্লাস ভর্তি হুইস্কি হাতে নিয়ে বসে থাকলাম নিষ্কপ অন্ধকারে।

সাধারণত এই রকম অন্ধকারে দ্বীপটা আমাকে আশ্চর্য এক শান্তির কোমল ভাজে জড়িয়ে ফেলে, মনে হয় আমি যেন বুঝতে পারি বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়। তবে এ রাতটা সেরকম নয়। এই লোকগুলো যেন সাথে করে বিষ নিয়ে এসেছে দ্বীপে। মেজাজ বিগড়ে আছে আমার। তবু রাগের নিচে, যখন আমি নিজের সাথে কারচুপি করছি না, পরিষ্কার অনুভব করছি একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনা, একটা উপভোগ্য গা হুমহুমে ভাব। আবার ঝুঁকি নেয়ার স্বাদ পাবার আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছি আমি। এখনও জানি না কিসের বাজি লড়তে হবে আমাকে, তবে অনুমান করতে পারছি

সেটা দারুণ মজার কিছু, দারুণ ভয়ঙ্কর কিছু না হয়েই যায় না। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ আজ আবার আমি কঠিন পাত্রদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।

নিভৃত, নির্জন অন্ধকারে নিজের সাথে একান্তে সময় কাটিয়ে আমি যখন উঠলাম, চাঁদের আলো মাথা চেউগুলো তখন সৈকতের। অনেক উপর পর্যন্ত উঠে আসতে শুরু করেছে। পাখা ঝাপটে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে জ্যোৎস্নায় নেশাগ্রস্ত একটা পাখি। ঘরে যেতে মন চাইছে না, অনেকটা জোর করে নিয়ে গেলাম নিজেকে এবং বিছানায় শুয়ে অপাপবিদ্ধ শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লাম অঘোরে।

চার

কথার হেরফের হলো না, পরদিন সকালে কাঁটায় কাঁটায় আটটায় এসে পৌঁছুল ওরা।

ইতিমধ্যে দুটো ইঞ্জিনই চালু করে দিয়েছি জলকুমারীর। জেটির মাথার কাছে ট্যাক্সি থেকে নেমে হেঁটে এগিয়ে আসছে ওরা, ফ্লাইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে দেখছি ওদেরকে। সমস্ত মনোযোগ আমার দলের তৃতীয় লোকটার উপর। প্রথম দর্শনেই বুঝলাম, এর জগতই আলাদা, ঘুঘু জোড়ার সাথে একেবারেই বেমানান। ছেলেটা রোগা, লম্বা, মুখে প্রফুল্ল হাসি। সাদা চামড়া রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। সাদা শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরেছে সে। সাঁতারুর চওড়া কাঁধ, দেখেই চেনা যাচ্ছে। হাত এবং পা জোড়া শক্তিশালী। ডাইভিং সরঞ্জাম কে ব্যবহার করবে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

ছেলেটার বয়স আঠারো উনিশের বেশি নয়। এক দিকের কাঁধে মস্ত একটা সবুজ ক্যানভাসের ব্যাগ ঝুলছে। বোঝা যাচ্ছে খুব ভারী ওটা, কিন্তু অনায়াসে বয়ে আনছে সে। আর কি এক খুশিতে হরদম কথা বলে যাচ্ছে। তার সঙ্গীদের কদাচ ঠোঁট নড়া দেখে বুঝতে পারছি হু-হাঁ করে সংক্ষিপ্তে উত্তর দিচ্ছে ওরা। ছেলেটাকে দুপাশ থেকে একজোড়া সেন্দ্ৰির মত পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে যেন।

কাছাকাছি এসে মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা, ওর চোখেমুখে তারুণ্যের প্রাণ চাঞ্চল্য ছাড়াও রোমাঞ্চের তৃষ্ণা এবং সরলতার ছাপ দেখতে পেলাম। হাই, আমার উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে হাসছে সে।

গ্রিটিংস, উত্তর দিয়ে হাসলাম আমিও। কিন্তু মনে মনে ভাবছি হিংস্র নেকড়ের পালে এই হরিণের বাচ্চা এল কিভাবে?

আমার নির্দেশনায় নোঙর টেনে তুলল ওরা। কাজটা করতে গিয়ে ওরা প্রমাণ করল এই ধরনের বোটের সাথে ছেলেটা ছাড়া বাকি দুজন পরিচিত নয়।

বন্দর ত্যাগ করার পর ছেলেটাকে নিয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠে এল ব্ল্যাঙ্ক। এর নাম নিরো, বলল সে।

সাথহে বাড়িয়ে দেয়া নিরোর হাতটা ধরলাম আমি। শূকনো এবং শক্ত লাগল ওর হাত। এটা একটা ডারলিং বোট, স্কিপার, বলল সে, খুশিতে চিকচিক করছে চোখ দুটো। কত লম্বা, চুয়াল্লিশ, নাকি পঁয়তাল্লিশ ফুট?

পঁয়তাল্লিশ, ওর প্রতি আরও একটু খুশি হয়ে বললাম আমি।

নিরো তোমাকে অর্ডার করবে, ব্ল্যাঙ্ক জানাল আমাকে, তুমি। ওর অর্ডার মেনে চলবে।

চমৎকার, বললাম তাকে, তারপর নিরোর দিকে তাকালাম।

লাল হয়ে উঠল নিরোর চেহারা। না, অর্ডার নয়, মি. রানা-কোথায় যাব আমরা আমি শুধু তাই জানাব আপনাকে।

বেশ। ঠিক সেখানেই নিয়ে যাব তোমাদেরকে আমি।

দ্বীপটা ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে বাঁক নেবেন আপনি।

আমি কিছু বলার আগেই ব্ল্যাঙ্ক জানাল, উপকূল বরাবর আফ্রিকান মেইন ল্যাণ্ড ঘেঁষে যেতে চাই আমরা।

চান ভাল কথা, ব্ল্যাক্কেৰ দিকে ফিৰে বললাম, কিন্তু ওদিকে ওৱা অনাহুত আগন্তুক দেখলে খেপে ওঠে, এ-কথা কেউ বলেনি আপনাকে?

তীৱেৰ কাছ থেকে যথেষ্ট দূৰে থাকব আমৱা।

এক মুহূৰ্ত ইতস্তত কৰলাম আমি। ভাবলাম, জেটিতে ফিৰে। গিয়ে এদেৱকে নামিয়ে দেব নাকি? কোথায় যেতে চান, নদীমুখেৰ উত্তৰে না দক্ষিণে?

উত্তৰে, বলল নিৰো।

উত্তৰে হলে ভাল, ওদিকে কোষ্টাল অ্যাকটিভিটি কম। একটা মাত্ৰ ক্ৰাশ বোট আছে জিনবালায়, কিন্তু সেটাৰ ইঞ্জিন হপ্তায় বড় জোৰ দুএকদিন ভাল থাকে এবং তীৰ বৰাবৰ স্থায়ীভাবে তৈৰি বিষাক্ত পাম-ৰস খেয়ে কুৰা প্ৰায় সবাই উন্মাদ হয়ে থাকে। ক্ৰু এবং ইঞ্জিন দুটোই যখন সুস্থ থাকে, ওদেৰ গতি ওঠে বড় জোৰ ফিফটিন নট, আৰ আমাৰ জলকুমাৰী আমি চাইলেই বাইশ নট স্পীডে ছুটে পাবে।

কিন্তু নদীৰ দক্ষিণ এলাকায় হেলিকপ্টাৰ নিয়ে পাহাৰা দেয় কোষ্টাল গাৰ্ডৰা, এবং নিজেদেৰ সমুদ্ৰসীমাৰ ব্যাপাৰে সাংঘাতিক স্পৰ্শকাতৰ ওৱা।

আমাৰ জন্যে আৰেকটা সুবিধে হল, জলকুমাৰীকে নিয়ে আমি উপকূল বৰাবৰ পানিতে ডুবে এবং জেগে থাকা পাথৰেৰ গোলকধাধাৰ মাঝখান দিয়ে অন্ধকাৰ ঝড়ো ৰাতেও অনায়াসে যেতে পাৰব। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানি, ক্ৰাশ বোটের কমাণ্ডাৰ এ ধৰনেৰ বীৰত্ব দেখানৰ মধ্যে নেই। ৰোদ ঝলমলে প্ৰশান্ত দিনেও জিনবালা বে-তে পড়ে থাকতেই পছন্দ কৰে সে।

ঠিক আছে, ব্ল্যাক্কেৰ জানালাম আমি, কিন্তু আপনি যা চাইছেন তাৰ জন্যে দৈনিক আড়াইশো ডলাৰ বেশি দিতে হবেডেঞ্জাৰ মানি।

সে ভয় আমিও কৰেছি-দেয়া যাবে, কি আৰ কৰা, নিৰ্বিকাৰ চিত্তে বলল ব্ল্যাক্কেৰ। বুঝলাম পানিৰ মত টাকা খৰচ কৰতে আপত্তি নেই এই লোকেৰ।

জলকুমারীকে ঘুরিয়ে অয়স্টার পয়েন্টে আলোর কাছাকাছি নিয়ে এলাম। রোদ ঝলমলে স্নিগ্ধ আজকের সকালটা, পরিষ্কার আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেঘ দেখে বোঝা যাচ্ছে ঝাঁক বাধা দ্বীপগুলোর অবস্থান, চোখ ধাঁধানো কোমল সাদা পাহাড় সারি সারি মাথা তুলে আছে। সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে আসা ট্রেড উইণ্ডের স্বাভাবিক গতি আফ্রিকা মহাদেশে ধাক্কা খেয়ে ব্যাহত হচ্ছে। ইনশোর চ্যানেলে এখানে আমরা ফিরে আসা সেই বাতাসের ধাক্কা খাচ্ছি। এলোমেলো ভাবে দমকা বাতাস ছোবল মারছে স্নান সবুজ পানিতে, উপরটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে সাদা ফেনায় ভরিয়ে তুলছে যতদূর দৃষ্টি যায়। খুব খুশি জলকুমারী, লাফ মারার এবং পানির উপর তলা পর্যন্ত তুলে বাতাস কেটে ছোট্ট একটা অজুহাত পেয়ে গেছে সে।

নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছেন আপনারা, নাকি এমনি খুঁজছেন? কথার পিঠে কথা বলার সুরে সহজভাবে জানতে চাইলাম। উৎসাহের সাথে আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নিরো, বুঝলাম সবকথা বলতে চাইছে সে।

উত্তেজিতভাবে মুখ খুলতে যাচ্ছে সে, এই সময় দ্রুত কথা বলে তাকে থামিয়ে দিল ব্ল্যাঙ্ক। এমনি খুঁজছি, ধমকের সুর। বেজে উঠল তার কণ্ঠস্বরে, সাথে সাথে খোলা মুখ বন্ধ হয়ে গেল নিরোর।

এদিকের পানি আমার চেনা। প্রতিটি দ্বীপ, প্রতিটি রীফ চিনি। আমি হয়ত আপনাদের প্রচুর সময় বাঁচিয়ে দিতে পারি-তার। সাথে বেশ কিছু টাকাও।

তুমি খুব ভাল ছেলে, সম্ভবত ঠিক উল্টোটা বোঝাতে চাইল ব্ল্যাঙ্ক, অন্তত তার কর্কশ, রুঢ় কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হল। ধন্যবাদ। আমরা নিজেরাই ম্যানেজ করতে পারব।

তাহলে তো কথাই নেই, শ্রাগ করলাম আমি।

নিরোর উদ্দেশ্যে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ব্ল্যাঙ্ক, তারপর আধপাক ঘুরে হেঁটে গেল ককপিটের শেষ প্রান্তে। নিরো তাকে অনুসরণ। করল। স্টার্ন রেইলের পাশে দাঁড়িয়ে নিরোকে উদ্দেশ্য করে নিচু। শান্ত গলায়, কিন্তু জরুরী ভঙ্গিতে ঝাড়া দুই মিনিট কথা বলল সে। নিরোর চেহারা থেকে উজ্জ্বলতা খসে পড়তে

দেখলাম আমি। আবার যখন ফ্লাইং ব্রিজে ফিরে এল সে, তার চেহারা য় রাগের ভাব দেখে একটু অবাকই লাগল আমার। বুঝলাম, ছেলেটা একেবারে পুতুল নয়।

পরিষ্কার বোঝা গেল, মাথা, অর্থাৎ ব্ল্যাক্সের নির্দেশেই কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ব্রিজের দিকে মুখ করে ফাইটিং চেয়ারে বসল পেশী অর্থাৎ প্যানথার। চেয়ারে হেলান দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করা একটা পা হাতলে তুলে দিয়ে বসে আছে সে, অথচ ভঙ্গিতে ফুটে রয়েছে বিশ্বাসঘাতক নেকড়ের আক্রমণাত্মক ভাব। ওর চোখে চোখ রেখে হাসলাম আমি, কিন্তু এক চুল নড়তে দেখলাম না ওর চোখের পাতা। মুখেও কোন রেখা ফুটল না। অকস্মাৎ কেন যেন মনে হল, মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে।

দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ হালকা সবুজ পানি কেটে এগোচ্ছে জলকুমারী, পানির নিচে কিন্তু তকিমাকার দৈত্য-দানবের মত ডুব দিয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে পাথরের পাঁচিল। প্রবাল দ্বীপগুলো সাদা বালিতে ঢাকা, রোদ লেগে তুষারের মত চিক চিক করছে। তার মাঝখানে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা, সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে পামগুলো, বাতাসের ঝাঁপটা খেয়ে মাথা দোলাচ্ছে।

দিনভর ব্যস্তভাবে একনাগাড়ে এগিয়ে চলল জলকুমারী, এর মধ্যে অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আভাস পাবার চেষ্টা করেছি আমি। ব্ল্যাক্সের কথা শোনার পর থেকে নিরো এখনও গম্ভীর এবং চুপচাপ। তার ব্যাগ থেকে বেরিয়েছে একটা বড়সড় স্কেল অ্যাডমিরাল্টি চার্ট। সেটায় আমাদের পজিশন কোথায় তাকে দেখলাম, সে আমাকে কয়েকবার কোর্স বদল করতে বলল।

চার্টে বিশেষ কোন চিহ্ন না থাকলেও সেটার উপর বারকয়েক নজর ফেলার সুযোগ পেয়ে বুঝে নিলাম রোভুমা রিভারের অসংখ্য মুখের পনরো থেকে ত্রিশ মাইল উত্তরে এবং তীর থেকে ষোলো মাইল পর্যন্ত দূরের এলাকা সম্পর্কে আমরা আগ্রহী। এই এলাকায় কয়েক একর থেকে শুরু করে কয়েক মাইল লম্বা আনুমানিক তিনশো দ্বীপ আছে। বিশাল খড়ের গাদা থেকে ওরা একটা জং ধরা ছোট্ট পিন খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে বলে মনে হল আমার।

ব্রিজে দাঁড়িয়ে প্রিয়তমা জলকুমারীর হৃৎকম্পন উপভোগ। করছি আর সামুদ্রিক জীব ও পাখিদের রকমসকম লক্ষ করছি, বেশ ভালই কাটছে সময়টা। ফাইটিং চেয়ারে বসা প্যানথারের মাথার পাতলা চুলের ভিতর টাকটা লালচে গোলাপী নিওন বাতির মত জ্বলজ্বল করছে। এই এলাকার সূর্য

সম্পর্কে ওকে সাবধান। করে দেবার কথা মনে হল, কিন্তু চেপে গেলাম ব্যাপারটা। পরদিন সারা গায়ে ঘামাচি ফুটল ওর, সারাটা দিন কষ্ট পেল চুলকানিতে। মুখটা সমুদ্রগামী জাহাজের পোর্ট লাইটের মত জ্বলছে।

দ্বিতীয় দিনের দুপুর নাগাদ একঘেয়েমিতে পেল আমাকে। সঙ্গী হিসেবে নিরো একেবারেই অপরিণত, তাছাড়া আগের সেই। সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব এখনও সে পুরোপুরি ফিরে পায়নি। গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে এত বেশি সচেতন সে যে কফি খাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করবে কি করবে না সিদ্ধান্ত নিতে ত্রিশ থেকে ষাট সেকেন্ড সময় নিচ্ছে।

ডিনারের জন্যে মাছ দরকার আমার, তাই একটু সতর্ক হয়ে লক্ষ রাখছি সমুদ্রের দিকে, এমন সময় সামনে একদল কিংফিশ। দেখলাম, সার্ভিসের বিশাল একটা ঝাঁকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

তাড়াতাড়ি হুইলটা নিরোকে দিয়ে বললাম, সোজা করে ধরে রাখো শুধু।

ককপিটে নেমে এলাম আমি। তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে আমাকে প্যানথার। কেবিনে উঁকি দিয়ে দেখি আমার ক্যাবিনেট খুলে নিজের খুশি মত জিন আর টনিক বের করে এন্টার খেয়ে চলেছে ব্ল্যাক্স। এই দুই দিন কেবিন থেকে তার না বেরুবার কারণ বোঝা গেল। দিনে সাড়ে সাতশো ডলার দিচ্ছে, সুতরাং কিছু বলতে গেলাম না ওকে। লকার খুলে একজোড়া ফিদার জিগ বেছে নিলাম। ঝাঁকের পাশ দিয়ে যাবার সময় গাঁথে ফেললাম একটা কিংফিশ। তড়পাচ্ছে, গায়ের সোনা রঙ ঝিলিক দিচ্ছে রোদ লেগে। লাইন গুটিয়ে নিলাম আমি। তারপর আমার ভারী বেইট নাইফের ফলা দিয়ে মাছটার লেজের নিচে থেকে কানকোর নিচে পর্যন্ত চিরে ফেললাম, নাড়িভুঁড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম পানিতে।

মাথার উপর একজোড়া সী-গাল ঘুর ঘুর করছিল, সাথে সাথে তারা তীক্ষ্ণ গলায় চঁচামেচি করে পানির দিকে ডাইভ দিল আবর্জনা তোলার জন্যে। তাদের চঁচামেচিতে আকৃষ্ট হয়ে আরও কয়েক জোড়া উড়ে এসে নরক গুলজার করে তুলল আমাদের পিছন দিকে।

ওদের চঁচামেচিতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে, তবু পিছনের মৃদু ধাতব শব্দটা ঠিকই শুনতে পেলাম আমি। অত্যন্ত পরিচিত বলেই সম্ভবত শব্দটা ফাঁকি দিতে পারেনি আমাকে। অটোমেটিক পিস্তলের

স্লাইড টেনে ছাড়া হল লোড এবং কক করার জন্যে। সচেতনভাবে নয়, সম্পূর্ণ ঝাঁক আর সহজাত প্রবৃত্তির বশে বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার শরীরে। এক পলকে বড় বেইট-নাইফটা আধপাক ঘুরে গেল আমার ডান হাতে। সেটাকে ছুঁড়ে মারার জন্যে ধরেই শরীরের একটা মাত্র ঝাঁকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝপ করে নামলাম ডেকের উপর। পায়ের পাতা আর বাঁ হাতের তালু দিয়ে ব্রেক ফল করছি, ইতিমধ্যে পিছিয়ে গিয়ে ছুরিটা উঠে গেছে। আমার ডান কাঁধের উপর-টাগেটি বরাবর তাক স্থির হতেই ছুঁড়তে যাচ্ছি সেটা।

ডান হাতে বড় একটা অটোমেটিক রয়েছে প্যানথারের। ন্যাভাল পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ, পুরানো পিস্তল, কিন্তু খুন করার জন্যে তুলনা হয় না-বুকে লাগলে ফুটোটা এত বড় হবে যে অনায়াসে একটা ফুটবল ঢুকে যেতে পারবে।

বেইট নাইফের লম্বা ফলা দিয়ে চেয়ারের পিঠের সাথে গেঁথে যাচ্ছিল প্যানথার, কিন্তু দুটো কারণে নতুন জীবন লাভ করল সে। এক, পয়েন্ট ফরটিফাইভটা আমার দিকে ধরা নয়। দুই, তার গোলাপী মুখে সকৌতুক বিস্ময়ের ভাব।

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে নিজেকে দমন করলাম। ধাতব শব্দ শোনার পর মাত্র দুই সেকেন্ড হয়েছে, আর এক সেকেন্ডের দশভাগের এক ভাগ যদি দেরি হয়ে যেত, ছুরিটা ছুটে যেত আমার হাত থেকে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি। এখন ও বুঝতে পারছে। মৃত্যুর কত কাছে চলে এসেছিল। রোদ পোড়া ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসিটা মলিন, জোর পাচ্ছে না। সিধে হয়ে দাঁড়ালাম আমি, টোপ কাটার বোর্ডে গেঁথে রাখলাম বেইট নাইফটা।

নিজের ওপর যদি দরদ থাকে, শান্ত গলায় বললাম ওকে, ওটা আর নাড়াচাড়া কোরো না আমার পিছনে।

নিজেকে সামলে নিয়েছে প্যানথার, আত্মবিশ্বাসে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। হা হা করে হাসল সে। রিভলভিং ফাইটিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে স্টার্নের দিকে লক্ষ্য স্থির করল, এবং ফায়ার করল পর পর দুবার। ইঞ্জিনের আওয়াজকে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ। করে দিল বিস্ফোরণের শব্দ, আমার নাক ছুঁয়ে বাতাসে উড়ে গেল করডাইটের গন্ধ। ডানা মেলা দুটো সী-গাল ছিন্নভিন্ন হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে

পড়ল শূন্যে, পালকগুলো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে চিকন সুতোর মত উড়তে লাগল বাতাসে। আতঙ্কে আতঁনাদ ছেড়ে যে যেকি পারল দ্রুত উড়ে চলে গেল ঝাঁকের অন্যান্য সী-গাল। বুঝলাম এক্সপ্লোসিভ বুলেট ব্যবহার করেছে প্যানথার।

চেয়ার ঘুরিয়ে আবার আমার মুখোমুখি হল সে, ঠোঁটের কাছে পিস্তল তুলে ফুঁ দিল মাজলে। তারপর বলল, দেখো ছোকরা, তোমাকে আমার চিনতে পারা উচিত, কিন্তু চিনতে পারছি না কেন, বল তো? দেয়ালে মাথা ঠোকো, বলে আমি ব্রিজ ল্যাডারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

থামো! পিছন থেকে হিস হিস করে উঠল প্যানথার।

দাঁড়ানো উচিত আমার, বুঝতে পারলাম। ইতিমধ্যে ওর পিস্তল ছোড়ার নৈপুণ্য এবং গোলমাল পাকানর ব্যগ্রতা লক্ষ করেছি। কিন্তু তবু আমি ওর ভুকুমে এখন আর দাঁড়াতে পারি না। সুবোধ বালকের খোলস একবার ঝেড়ে ফেলার পর সেই খোলসে আবার গা ঢাকা দেয়া চলে না। প্যানথারকে এখন বুঝতে দেয়া উচিত যে তাকে আমি গ্রাহ্য করি না। তা নাহলে মাথায় চড়তে চেষ্টা করবে ও।

থামো!

লাফ দিয়ে পানিতে পড়ো!

একহাতে জিনের গ্লাস নিয়ে এতক্ষণ কেবিনের দরজায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল ব্ল্যাক্স। পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ফিসফিস করে কথা বলে উঠল সে।

এখন বুঝতে পারছি, তুমি কে! চেনা চেনা লাগছিল, অথচ চিনতে পারছিলাম না বলে বড়ই বেচায়ন ছিলাম আমরা।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্ল্যাক্সের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছি নিঃশব্দে। আমাকে ছাড়িয়ে চলে গেল তার দৃষ্টি। প্যানথারকে বলল, চিনতে পারছ এখন, প্যানথার? মাথা নাড়ল প্যানথার-চিনতে পারছে

না। ব্ল্যাক্স আবার বলল, এর ছবি দেখেছ তুমি। কোথায় দেখেছ একটু ভেবে দেখ। তখন এর দাড়ি ছিল না।

প্যানথার নিশ্চুপ। এখনও সে চিনতে পারছে না। ভুরু কুঁচকে ভাবছে।

ডায়মণ্ড কেলেক্সারি! আবার বলল ব্ল্যাক্স। ছাঁৎ করে উঠল আমার বুক। মেজর জেনারেল রাহাত খানের একটা নির্দেশের কথা মনে পড়ে গেল। যে-কোন মূল্যে আমার আসল পরিচয় গোপন রাখতে হবে। এটা জানাজানি হয়ে গেলে আমার প্রাণের এক পয়সা মূল্য থাকবে না আর।

জেসাস! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্যানথার, এইবার চিনেছি! বিস্ময় এবং হিংস্র উল্লাস প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। গুরুদয়াল সিং!

মই বেয়ে উঠে এলাম ব্রিজে।

দুঃখিত, নিরোর কাছ থেকে হুইল নেবার সময় আমাকে। বলল সে, ওর কাছে পিস্তল আছে একথা আপনাকে আমার বলা উচিত ছিল।

দ্রুত চিন্তা করছি আমি। কার কাছে আমার ফটো দেখেছে এরা? সিডনি শেরিডান? তার সাথে কিসের সম্পর্ক এদের? খবর পেলেই শেরিডান আমার ব্যবস্থা করার জন্যে লগুন থেকে হাত বাড়াবে। বুঝতে পারছি এখনই বাধা দিতে হবে আমাকে। তা দিতে হলে ব্ল্যাক্স আর প্যানথারের বেঁচে থাকা চলে না। ঘাড় ফিরিয়ে ককপিটের দিকে তাকিয়ে দেখি নেই ওরা। প্যানথারকে নিয়ে নিচে নেমে গেছে ব্ল্যাক্স।

এক আঘাতে একই সাথে দুজনকে খতম করা তেমন কঠিন নয়, অ্যাকসিডেন্ট বলে চালিয়ে দেয়াও সম্ভব। বয়স অল্প ছিল বলেই এই ধরনের এসপার-ওসপার সিদ্ধান্ত নেবার কথা ভাবছিলাম আমি...কিন্তু ওদিকে সিদ্ধান্তটা কার্যকরী করার জন্যে নিজের পুরোপুরি সমর্থনও পাচ্ছিলাম না।

নিরোর দিকে তাকালাম। নিঃশব্দে হাসছে সে। প্রশংসার সুরে বলল, চোখের পলকে যা দেখালেন! আর একটু হলে মাইক কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছিল।

এই বাচ্চাটাকেও? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। ওদের দুজনকে যদি যেতে হয়, একেও যেতে হবে, তা নাহলে ব্যবস্থাটা কাচাই থেকে যাবে। হঠাৎ সাংঘাতিক ঘৃণা হল নিজের ওপর। এসব কি ভাবছি আমি? আমি খুনী নই, অথচ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার কথা ভাবছি কেন?

আপনি অসুস্থ, স্কিপার? দ্রুত জানতে চাইল নিরো। আমার মুখের রঙ বদল দৃষ্টি এড়ায়নি ওর।

আরে না, বললাম ওকে। আপত্তি না থাকলে আমাদের জন্যে দুই ক্যান ঠাণ্ডা বিয়ার নিয়ে আসতে পার তুমি।

নিরোকে নিচে পাঠিয়ে দিয়ে ধীর-স্থির ভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম। ওদের সাথে রফা করব আমি। গোপন একটা উদ্দেশ্য আছে। ওদের, শেষ পর্যন্ত আমার কাছে সেটা গোপন রাখতে পারবে না ওরা। ওদেরকে বলব, আমার ব্যাপারে যদি মুখ বুজে থাকে, আমিও ওদের ব্যাপারে মুখ বুজে থাকব। নিচে ওরাও সম্ভবত এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে।

ভূইলে তালা লাগিয়ে পা টিপে টিপে ব্রিজের শেষ প্রান্তের দিকে এগোচ্ছি, নিচের কেবিন থেকে যাতে ওরা আমার পায়ের শব্দ শুনতে না পায়। সেলুন টেবিলের উপর ভেন্টিলেটরটাকে ভয়েস টিউবের বিকল্প বলা চলে, অনেক আগেই আবিষ্কার করেছি যে নিচের কথাবার্তা বাতাসে চড়ে ঝাঝরি দিয়ে চমৎকার গলে আসে। তবে পরিষ্কার শুনতে পাওয়াটা নির্ভর করে বাতাসের বেগ, কেবিনে বস্তাদের অবস্থান, আর তাদের কণ্ঠস্বরের তারতম্যের ওপর।

বাতাসের গর্জন যখন চাপা পড়ে যাচ্ছে না তখন নিরোর গলা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, সম্ভবত ভেন্টিলেটরের ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে সে এবং কথা বলছে ওদের দুজনের চেয়ে জোরে।

স্কিপারকে এখুনি জিজ্ঞেস করছেন না কেন? বাতাসের তীব্র শিশে চাপা পড়ে গেল উত্তরটা। আবার যখন শিস থামল, নিরোর গলাই ভেসে এল ভেন্টিলেটার দিয়ে।

আজ রাতেই যদি কাজটা করতে চাই আমরা, কোথায় আপনি... পরের কথাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল বাতাস। ভোরের আলো পেতে হলে আমাদেরকে... গোটা আলোচনাটা সময় এবং স্থান সম্পর্কে বলে

মনে হচ্ছে। ভোরে হারবার ত্যাগ করে কি সুবিধে পেতে চাইছে ওরা ভাবছি, এই সময় আবার শুনতে পেলাম নিরোর গলা, প্রতিবাদের সুরে সে বলছে, কেন? আমি তো বুঝতে পারছি না অসুবিধেটা কোথায়... ঠিক এই সময় কড়া সুরে কথা বলে উঠল ব্ল্যাক্স, নিশ্চয়ই এগিয়ে এসে নিরোর সামনে দাঁড়িয়েছে সে, এবং সম্ভবত হুমকির ভাব ফুটিয়ে তুলেছে চেহারায়।

দেখো, এদিকের এসব ব্যাপারে খবরদার মাথা গলাবে না তুমি। তোমার কাজ জিনিসটাকে খুঁজে বের করা, সে-ব্যাপারে ঘোড়ার ডিম কিছুই করতে পারনি তুমি এখন পর্যন্ত...

দূরে সরে যাচ্ছে ওদের গলার আওয়াজ, পরিষ্কার আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। একটু পরই দরজা বন্ধ বা খোলার শব্দ পেলাম। দ্রুত ফিরে এসে দাঁড়ালাম ভাইলের কাছে। এমনি সময়ে ডেকের কিনারায় মাথা দেখা গেল নিরোর, মই বেয়ে উঠে আসছে সে।

ওর বাড়ানো হাত থেকে বিয়ারের ক্যানটা নিলাম। আগের চেয়ে সহজ লাগছে ওকে। হাসির মধ্যে বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসের ভাব রয়েছে। মি. ব্ল্যাক্স বলছেন আজ আর বেশিদূর গিয়ে লাভ নেই। এবার আমরা ফিরে যাব।

স্রোতের উপর দিয়ে জলকুমারীকে ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে এগোচ্ছি দ্বীপের দিকে। টার্টল বের মুখ পেরিয়ে এসে পাম গাছের ভিতর দেখতে পেলাম আমার শান্তির নীড়টাকে। হঠাৎ একটা স্ফোভে ভরে উঠল আমার বুক।

নিজের সম্পর্কে সব সময় উঁচু ধারণা পোষণ করেছি আমি। নিজেকে চিনি, নিজের যোগ্যতার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখি বলেই সম্ভব হয়েছে এটা। শারীরিক যোগ্যতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা অর্জনের জন্যে জ্ঞান হবার পর থেকে কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমার আত্মবিশ্বাস কারও চেয়ে কম নয়, তার কারণ নিজেকে মনের মত করে গড়ে তোলার কাজে কখনও ফাঁকি দিইনি আমি। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্যে ভদ্র হওয়া একটা অলঙ্ঘনীয় শর্ত, সে চেষ্টাই করছি। বসুন্ধরা শক্তির ভক্ত, নিজেকে আমি সেভাবেই গড়ে তুলেছি। উচ্চাশা ছাড়া মানুষের উত্তরণ ঘটে না, তাই আমিও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তিন বছর আগে প্রমাণিত হয়ে গেছে এসব মিথ্যে এবং পণ্ডশ্রম মাত্র। দেশের প্রতি বুকভরা ভালবাসা ছিল, সেজন্যেই সেনাবাহিনীতে গিয়েছিলাম। দেশের আরও বেশি সেবা করার সুযোগ পাব বুঝতে পেরে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল? কোন

অন্যায় করিনি আমি, অথচ মাথা পেতে নিতে হয়েছে দ্বীপান্তরের শাস্তি। তবু যদি জানতাম দেশের মস্ত ক্ষতি করছে যে লোকটা, সেই সিডনি শেরিডান উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে, এতটা দুঃখ হত না। অপরাধী বেঁচে গেল, শাস্তি পেতে হল আমাকে-এটা কেমন বিচার?

বুঝতে পারি, শেষ হয়ে গেছি আমি। আমার ক্যারিয়ার খতম, উচ্চাশা খতম, দেশ সেবার কোন সুযোগ আর কখনও পাব না। তিনটি অমূল্য বছর নষ্ট হয়েছে, আরও কত বছর নির্বাসনে কাটাতে হবে জানি না। যখন দেশে ফিরব, যদি কখনও ফেরার সুযোগ হয়, কি হয়ে ফিরব তখন আমি? কে আমায় বুঝবে? গিয়ে দেখব বদলে গেছে সব কিছু, জুনিয়ররা অনেক ধাপ টপকে উঠে গেছে ওপরে, আরও ভাল ট্রেনিং পেয়েছে তারা-তাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছি আমি। সন্দেহ নেই, এই রকম দাঁড়াতে পরিস্থিতি। সেক্ষেত্রে নতুন করে শুরু করতে হবে আমাকে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

না। সম্ভব নয় জানি বলেই দেশে ফেরার কথা আর ভাবি না। বেশ তো আছি এই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় সেন্ট মেরী দ্বীপে, কি দরকার বিড়ম্বনা বাড়িয়ে? ছোট্ট একটা ভুল করেছিলাম, ব্যস, নির্মম রায় দিয়ে পার্টিয়ে দেয়া হল আমাকে-ভুল সংশোধনের একটা সুযোগও দেয়া হল না। একটা মাস সময়ও যদি পেতাম, আমি জানি, সিডনি শেরিডানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সব তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে পারতাম আমি। কিন্তু সে সুযোগ আমাকে দেয়া হয়নি।

চুপচাপ হজম করেছি অবিচারটা, এছাড়া কিছু করার ছিল না আমার। তারপর একটু একটু করে মন বসিয়েছি স্বদেশ থেকে হাজার মাইল দূরের এই বিদেশী দ্বীপে-বেশ আনন্দেই তো আছি। কিন্তু ভাগ্যাকাশে আজ আবার দেখা দিয়েছে অশুভ কালো মেঘ।

আবার ভাবলাম, অশুভ বটে, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে এই কালো মেঘের ওপারেই লুকিয়ে আছে ঝলমলে সুদিন, এই কালো মেঘই বুঝি নিয়ে এসেছে অভিশাপ-মুক্তির একটা সুবর্ণ সুযোগ। যদিও আমার এই মনে হওয়ার পেছনে কোনই যুক্তি-প্রমাণ নেই।

কারা এরা? কে পার্টিয়েছে এদেরকে? কি খুঁজছে? কোথায় দেখেছে আমার ফটো? এক এক করে অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মনে। একটার উত্তরও জানা নেই আমার। আমার প্রতি নিরোর ক্ষীণ একটু দুর্বলতা লক্ষ করেছি, সেটাকে কাজে লাগানো যায় না? এই ভেবে ফিরলাম ওর দিকে।

চ্যানেলের ওপর দিয়ে গ্র্যাণ্ড হারবারের দিকে এগোচ্ছে জলকুমারী। গুরুত্বহীন হালকা বিষয়ে কথা বলছি আমরা। অনুমান করতে পারছি আমি, নেকড়েজোড়া তাদের উদ্দেশ্য সবটা। প্রকাশ করেনি নিরোর কাছে। ছেলেরা সরল, বুঝতেই পারছে না কি ভয়ঙ্কর প্ল্যান এঁটেছে ওরা। তাই এখনও স্বাভাবিক আচরণ করতে পারছে ও। চতুরতা ওর ধাতে নেই, তার প্রমাণও দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। নিরোর পুরো নাম সামরিক গুপ্ত-তথ্যের মত গোপন করে গেছে আমার কাছে ব্ল্যাঙ্ক, নিশ্চয়ই নিরোকেও সতর্ক করে দিয়েছে সে, কিন্তু নিরো সতর্ক হতে পারেনি। তার গলায় একটা সিলভারের চেন রয়েছে, তাতে একটা পিতলের চাকতি ঝুলছে, চাকতিতে খোদাই করা রয়েছে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে একটা সতর্কবাণী জে. এ. নিরোকে পেনিসিলিন দেয়া যাবে না। চাকতিটা লুকিয়ে রাখার কথা মনেই পড়েনি নিরোর।

হালকাভাবে প্রশ্ন করে এক-আধ টুকরো তথ্য জেনে নিচ্ছি। ভবিষ্যতে এগুলো কাজে লাগতেও পারে। আমার অভিজ্ঞতায় বলে, অজ্ঞানতাই তোমার সবচেয়ে ক্ষতির কারণ হতে পারে। নিজেকে আরও যাতে মেলে ধরার ইচ্ছা জাগে ওর তাই এমন সব বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলাম যা শুনে বিস্মিত এবং কৌতূহলী হয়ে ওঠে ও।

চ্যানেলের ওদিকে ওই রীফটা দেখতে পাচ্ছ, যেখানে উথলে পড়ছে স্রোতটা? ওটা ডেভিল ফিশ রীফ-বিশ ফ্যাডম খাড়া নেমে গেছে সাগরের নিচে। বিশাল সব বুল ফ্রপারদের আস্তানা ওটা। ওখানে ওদের একটাকে মেরেছিলাম গত বছর, ওজন ছিল দুশো কিলোর বেশি।

দুশো কিলো! সবিস্ময়ে বলল নিরো। মাই গড, তার মানে প্রায় সাড়ে চারশো পাউণ্ড!

হ্যাঁ। তার মুখের ভিতর তোমার মাথা এবং কাঁধ দুটো অনায়াসে ঢুকে যাবে।

এর একটু পরই মুখ খুলল নিরো। ইতিহাস এবং দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করছিল সে কেমব্রিজে, কিন্তু সাগরের পিছনে বড় বেশি লেগে থাকার দরুন লেখাপড়াটা ছাড়তে হয়েছে। এখন সে ছোটখাট একটা ডাইভিং ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই কোম্পানি এবং আগার ওয়াটার স্যালভেজ আউটফিটের মালিক। এ থেকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মত রোজগারও করছে সে, আবার হস্তায় প্রায় প্রতিদিনই ডাইভ দেয়ার সুযোগও পাচ্ছে। ব্যক্তিবিশেষের অর্ডার নেয় সে। সরকার এবং নেভীর কিছু কাজ করার জন্যেও চুক্তি করেছে।

দুবার রাফেলা নামটা উচ্চারণ করল ও। হালকাভাবে জানতে চাইলাম, কে? গার্লফ্রেন্ড, নাকি ওয়াইফ?

বোন, স্নেহময়ী বড় বোন-ও-ই তো ব্যবসার মাথা, খাতাপত্র সব ঠিকঠাক রাখে। আরও কিছু কথা বলল ও। ওর বোন নাকি একজন কংকোলজিস্ট, সী-শেল থেকে বছরে দুহাজার পাউণ্ড রোজগার করে। কিন্তু নেকড়েদের সান্নিধ্যে এল কিভাবে বা নিজের স্পার্টস শপ ছেড়ে দুনিয়ার অর্ধেকটা ঘুরে এখানে কেন এসেছে সে-সম্পর্কে কিছু বলল না। অ্যাডমিরালটি জেটিতে নামিয়ে দিলাম ওদেরকে। তারপর সন্ধ্যার আগে রি-ফুয়েলিংয়ের জন্যে জলকুমারীকে নিয়ে চলে গেলাম শেল বেসিনে।

পাঁচ

সেদিন সন্ধ্যায় কয়লার গনগনে আগুনে ধরে গ্রিল করে নিলাম কিংফিশটাকে। আলুর চপগুলোকে ঠাণ্ডা বিয়ারে ধুয়ে নিয়ে বসলাম বারান্দায়। পামগাছের ফাঁক দিয়ে সৈকতে দেখা যাচ্ছে সাদা ফেনারশি। সাগর যেন উন্মাতাল হয়ে উঠেছে আজ, বড় বেশি তোলপাড় লক্ষ করছি। নাকি মনের অস্থিরতার জন্যে এমন লাগছে? পামগাছের ফাঁকে হেডলাইট দুটোকে দেখে একটুও অবাক হলাম না। জানতাম ওরা আসবে। গेटটা তাই খুলেই রেখেছি।

ভিতরে ঢুকে ট্যাক্সিটা আমার পিকআপের পাশে থামল। ড্রাইভারকে গাড়িতে রেখে নামল ওরা দুজন। নিরোকে হিলটনে রেখে এসেছে ওরা।

পিছনে প্যানথারকে নিয়ে বারান্দায় উঠে এল ব্ল্যাক্স।

ড্রিঙ্ক? সাইড টেবিলের বোতল আর বরফের দিকে ইঙ্গিত করলাম আমি। নিজেদের জন্যে দুটো গ্লাসে জিন ঢালল প্যানথার। আমার সামনের চেয়ারটায় বসল ব্ল্যাক্স।

গেট খোলা, টেবিলে তিনটে গ্লাস, বারান্দায় অতিরিক্ত একটা চেয়ার, বলল ব্ল্যাক্স, তুমি জানতে আমরা আসব?

নিঃশব্দে হাসলাম শুধু।

আমার মাছ খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ব্ল্যাক্স, তারপর বলল, কয়েকটা ফোন করে জানলাম বছর তিনেক আগে আগস্ট মাসে লণ্ডন থেকে গায়েব হয়ে গেছে গুরুদয়াল সিং, সেই থেকে তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। আরও কয়েক জায়গায় খবর নিয়ে জানা গেল সেই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়া থেকে মাসুদ রানা নামে এক লোক জলকুমারী নামে একটা বোট নিয়ে এই দিকে এসেছে। বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ গুরুদয়াল সিং এবং মাসুদ রানা নাকি একই ব্যক্তি। হাঁটুর উপর একটা দাগ এবং ডান বাহুর উপর একটা বুলেটের আঁচড় নাকি তাই প্রমাণ করে। এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে, মাসুদ রানা?

কিছু বলার নেই। সরু, কালো একটা চুরুট ধরিয়ে ব্ল্যাঙ্কের মুখের দিকে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লাম আমি।

ঝট করে আমাদের দুজনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল প্যানথার। তার রাগের কারণ বোঝা গেল এক মুহূর্ত পর। ওস্তাদের যত নরম কায়দা! চাপা স্বরে স্ফোভ প্রকাশ করছে সে। এত করে বললাম প্রথমে ওর কটা দাঁত ভাঙার সুযোগ দাও আমাকে, তা না...

তুমি ব্যবসা বোঝ না, মৃদু কণ্ঠে বলল ব্ল্যাঙ্ক। তারপর চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, বেশ গুছিয়ে নিয়েছ দেখছি। আরামেই আছ তাহলে? কিন্তু দুই লাখ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের দাও মেরে কি এর চেয়ে আরামে থাকতে পারতে না? ভয় পেয়ে একেবারে এতদূরে, এই নির্জন, গাঁয়ো জায়গায় পালিয়ে এসেছ!

সিডনি শেরিডানকে সত্যি ভয় পাই, মৃদু কণ্ঠে বললাম আমি।

কিন্তু টোপটা নিল না ব্ল্যাঙ্ক। এই নামের কাউকে চেনে সে ভাবই দেখাল না। আবার জিজ্ঞেস করল, সুখ এবং শান্তির সংজ্ঞা এক-একজনের কাছে এক-এক রকম-তুমি বোধহয় এখানে খুব। সুখেই আছ, কি বল?

হ্যাঁ-তবে খেটে খেতে হয়।

কিন্তু জেলখানায় ইট ভাঙা বা মাটি কাটার চেয়ে আরামে আছ, অস্বীকার করতে পার?

তা ঠিক।

আমাদের নিরো থোকা কাল তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবে। সে যা জানতে চাইবে, চেপে না রেখে সব তাকে জানাবে তুমি, রানা। তোমার কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা চাই আমি। কাজ শেষ করে যখন চলে যাব, আমাদের সাথে দেখা হয়েছিল একথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে তুমি। আমরাও কাউকে বলব না কোথায় আছে। গুরুদয়াল সিং ওরফে মাসুদ রানা। রাজি?

সম্পূর্ণ, বললাম আমি। কিন্তু বুঝলাম, ওদের কাজ শেষ। হবার আগেই আমি কিছু করে বসতে পারি ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে ওরা, সেজন্যেই আমাকে অভয় দিতে এসেছে। আপোস রফার প্রস্তাবটা ভুয়া, ওরা ফিরে যাবার আগে স্থায়ীভাবে আমার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে, তা সে যেভাবেই হোক।

ভাবলাম কাল সকালে ওরা খুব ভোরে রওনা হতে চাইবে,। কিন্তু সে-সম্পর্কে কোন কথা না বলেই বিদায় নিল। ঘুম আসবে বুঝতে পেরে সৈকতে নেমে এসে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। বে-র বাকটা নিয়ে মার্টিন পয়েন্ট পর্যন্ত চলে এসেছি। ঝড়ে ধরাশায়ী একটা গাছের চওড়া কাণ্ড কবে জানি গড়িয়ে নেমে এসেছে সৈকতে, রাতে কখনও এদিকে এলে ওটার উপর বসি আমি। আজ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম।

চারদিকে কোথাও কেউ নেই, সামনে উত্তাল সাগর, তার। উন্মত্ত বিলাপ আর বাতাসের আহাজারী। নিজেকে নিঃসঙ্গ আর। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে হল আমার। কে আমি? কোথা থেকে এলাম, আর কোথায় যাব? নিখিল বিশ্ব...কোথায় এর শেষ? প্রশ্নের শেষ নেই, কিন্তু কে দেবে উত্তর?

এক সময় ক্লান্তিতে চোখ বুজলাম আমি, তারপর আবার যখন চোখ মেলে তাকালাম, তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে, পাম গাছের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে-গ্রাম, শিশুকাল, শিশির ভেজা মাঠ, নকশী কাঁথা, পদ্মপাপড়ির মত মায়ের খোলা চোখ আর শোলক বলা কাজলা দিদির কথা মনে পড়ে গেল। ব্যথায় টনটন করে উঠল বুকটা। উঠে দাঁড়ালাম আমি। চাঁদের আলোয় তাকিয়ে দেখি উথালপাথাল সাগর আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, বলছে, চলে এসো, চলে এসো-আমিই তোমার আদি মাতা।

.

পরদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই জেটিতে পৌঁছুলাম। গিয়ে দেখি ডিঙি নৌকাটা নেই সেখানে। ফেরীর ফোরম্যান হ্যামবোন আমাকে তার ডিঙিতে তুলে নিল। নোঙর ফেলা জলকুমারী অনেক দূরে কুয়াশায় ঢাকা। কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম ককপিটে ঘোরাফেরা করছে পরিচিত একটা অস্পষ্ট মূর্তি।

হেই রডরিক, লাফ দিয়ে ডেকে নেমে বললাম, বেগম বুঝি ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে তোমাকে?

আমার দিকে ফিরেও তাকাল না রডরিক। দিনের আলো এখনও ভালভাবে ফোটেনি, অথচ গোটা ডেক ঝকঝক করছে। ধাতুর তৈরি প্রতিটি জিনিস মেজেঘষে আয়নার মত করে তোলা হয়েছে। জলকুমারীকে আমার মতই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে রডরিক, মাঝেমাঝে সন্দেহ হয়, আমার চেয়ে বুঝি একটু বেশিই ভালবাসে।

এটা কি একটা বারোয়ারী পেছাবখানা, মাসুদ? সাবানপানি দিয়ে ডেকটা দ্বিতীয়বার ধুচ্ছে রডরিক। কেমন লোক তোমার এই পার্টি, বোটের মর্যাদা বোঝে না! আরে, কোথায় পা ফেলছ?

এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়লাম আমি।

পা মুছে তারপর যেখানে খুশি যাও, সতর্ক করে দিল আমাকে। তারপর বলল, তোমার জন্যে কফি তৈরি করে। রেখেছি, সেলুনে চলে যাও।

তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম সেলুনে। বুঝলাম ঘন্টা দুই আগে পৌঁছেচে রডরিক, সেই থেকে জলকুমারীকে দম ফেলার ফুরসত দেয়নি।

খানিক পর সেলুনে এল ও। প্রকাণ্ড মুখটা থমথম করছে। বুঝলাম কি যেন বলতে চায় আমাকে। জিজ্ঞেস করলাম, ল্যাম্পনি কোথায়?

রায়ানো বেওয়াদের মনোরঞ্জন করছে, কর্কশ গলায় বলল ও।

সমর্থ সব পুরুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই সেন্ট মেরীতে, তাই তাদের বেশির ভাগই রায়ানো দ্বীপে মার্কিন এয়ারফোর্স বেস-এ তিন বছরের চুক্তিতে কাজ করতে যায়। যুবতী স্ত্রীদের রেখে যায় সেন্ট মেরীতে, রডরিকের ভাষায় এই সকল মেয়েরা রায়ানো বেওয়া।

ল্যাম্পনিকে দুধা লাগানো দরকার তোমার, মাসুদ, চিন্তিতভাবে বলল রডরিক। এভাবে চললে আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওর মগজ পচে যাবে। সেই সোমবার থেকে আজ পর্যন্ত রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা এতেই মেতে আছে ও।

ল্যাম্পনির ভাল-মন্দের ব্যাপারে সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকে রডরিক, কিন্তু এই মুহূর্তে ওর কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটু ঔষ্যার সুরও লক্ষ্য করলাম।

আমি চুপ করে আছি দেখে প্রসঙ্গ বদল করল ও। জানতে চাইল। তোমার পার্টির লোকেরা কেমন?

প্রচুর টাকা দিচ্ছে।

কফির কাপ থেকে মুখ তুলে এই প্রথম আমার দিকে তাকাল রডরিক। বলল, তোমরা মাছ ধরছ না, মাসুদ। কুলি পীক থেকে লক্ষ্য করেছি আমি। চ্যানেলের ধারে-কাছেও যাও না। ইনশোরে কি যেন করছ তোমরা।

ঠিক ধরেছ, রডরিক, এরবেশি কিছু বললাম না আমি, কোন প্রশ্নও করল না ও।

শুধু বলল, এই, মাসুদ। ওদের ওপর নজর রেখো। মেজাজ গরম করবে না, আর ভুলেও অসতর্ক হবে না। মানুষ ভাল না ওরা। ছোকরাটার কথা জানি না, কিন্তু বাকি দুজন অসুবিধে।

মনে রাখব তোমার কথা।

গত বছর হোটেলে যে নতুন মেয়েটা এসেছে, মারিয়া, তাকে তো তুমি চেন।

ভুরু কুঁচকে উঠল আমার। শুধু সুন্দরী নয়, অত্যন্ত সাদাসিধে আর সরল মেয়ে মারিয়া। দ্বীপের সবাই ওকে পছন্দ করে। কি হয়েছে তার?

গত রাতের খবর এটা, বলল রডরিক। লালমুখোটা মারিয়াকে নিজের কামরায় নিয়ে গিয়েছিল।

অতিরিক্ত দুপয়সা কামাবার জন্যে হোটেলের কাজ সেরে বাছাই করা কিছু বোর্ডারের মনোরঞ্জন করতে যায় বটে মারিয়া। বললাম, তাতে কি হয়েছে?

লোকটা প্রচণ্ড মারধোর করেছে মারিয়াকে, কফি শেষ করে পিরিচে ঠক করে কাপটা নামিয়ে রাখল রডরিক। তারপর এত বেশি টাকা দিয়েছে যে মারিয়া আর পুলিশের কাছে যায়নি।

নিঃশব্দে শুনলাম কথাটা, কিন্তু প্যানথারের উপর রাগের মাত্রা আরও কয়েক ডিগ্রী বাড়ল আমার। মারিয়ার মত মেয়ের গায়ে হাত তোলা শুধু কাপুরুষতা নয়, চরম নীচতার পরিচয়।

লোক ভাল নয় ওরা, মাসুদ। এটা তোমার জানা উচিত বলে মনে করি।

ধন্যবাদ, রডরিক।

পরমুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠল রডরিক। সাবধান-ফের যদি ওরা জলকুমারীকে নোংরা করে, তোমাকে ধরব আমি। সেলুন আর ডেক হেগে-মুতে বিচ্ছিরি করে রেখেছিল-চোখ বুঁজে ছিলে নাকি?

জলকুমারীকে অ্যাডমিরালটি জেটিতে নিয়ে আসতে আমাকে। সাহায্য করল ও, তারপর গজ গজ করতে করতে নেমে গেল। জানি, সারাটা দিন স্ত্রীর কাছে আমার নামে অসংখ্য অভিযোগ করবে ও আজ। জলকুমারীর দুর্দশা দেখলে মেজাজ ঠিক থাকে না ওর।

রোদ উঠতে একা পৌঁছুল নিরো। হাই, স্কিপার, ডেকে লাফিয়ে পড়ে একগাল হাসল সে।

সেলুনে নিয়ে গিয়ে কফি খেতে দিলাম ওকে। আমার কাছ থেকে কি নাকি জানার আছে তোমার, সত্যি?

দেখুন, মি. রানা, তার বক্তব্য আমাকে বিশ্বাস করাবার। জন্যে ব্যস্ততার সাথে বলল নিরো, আরও আগে আপনার সাহায্য চাওয়ার জন্যে আমি দায়ী নই। আমি ওদেরকে প্রথম থেকেই বলেছি, স্কিপার ভাল মানুষ, তার সাহায্য নিতে পারি আমরা। কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। যাই হোক, আজ হঠাৎ ওরা আমার কথা মেনে নিয়েছে।

যাই হোক, অন্যমনস্কভাবে বললাম আমি। ভাবছি অন্য কথা। নিরোকে একা আসতে দিল কেন ব্ল্যাঙ্ক? এর একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে, নিরো মূল্যবান কিছু তথ্য নিজের কাছে রেখে দিয়েছে, যা সে এখুনি ওদের সাথে ভাগাভাগি করতে চায় না। এই রহস্যময় তথ্যগুলোই নিরোর ইনশিওরেন্স। তাই আমার সাথে আলোচনার সময় সাথে আর কাউকে নিতে চায়নি সে। তারাও জোর খাটাতে পারেনি।

স্কিপার, আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল নিরো, আমরা একটা দ্বীপ খুঁজছি, নির্দিষ্ট একটা দ্বীপ-কেন, তা আমি আপনাকে বলতে পারব না। দুঃখিত।

কিছু এসে যায় না, ওকে জানালাম। কিন্তু মনে মনে বললাম, ওদের কাছ থেকে কি আশা কর তুমি, নিরো? সেই নির্দিষ্ট দ্বীপে ওদেরকে একবার নিয়ে গেলেই তোমার প্রাণের শত্রু হয়ে উঠবে ওরা, এ কথা কি একবারও ভাবছ না? সুদর্শন চেহারার দিকে আরেকবার তাকালাম আমি। হঠাৎ অনভ্যস্ত স্নেহে ছেয়ে গেল আমার বুক। সম্ভবত ওর সরলতাই এর কারণ। দেখলাম রোমাঞ্চের উত্তেজনায় ছেলেটা একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, ক্লান্ত বুড়ো দুনিয়াটা যে আসলে জায়গা হিসেবে খুব ভাল নয় সে সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই।

কিছু যদি মনে কর, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

একশোবার, স্কিপার-কি আবার মনে করব! উৎসাহ দিয়ে বলল নিরো।

কতটুকু চেন তুমি ওদেরকে, নিরো? বিস্ময় ফুটে উঠল নিরোর চোখে, পরমুহূর্তে গম্ভীর হল সে। ভালই চিনি, সাবধানে উত্তর দিল সে। কেন?

একমাসও হয়নি ওদের সাথে পরিচয় হয়েছে তোমার, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লাম, নিরোর চেহারা দেখে বুঝলাম ঠিক জায়গাতেই গিয়ে লেগেছে সেটা। কিন্তু জ্ঞান হবার পর থেকে এ ধরনের লোকদেরকে চিনি আমি।

কিন্তু আপনার এসব কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না, মি. রানা। ওকে ছেলেমানুষ ধরে নিয়েছি, এটা বুঝতে পেরে বিরূপ হয়ে উঠেছে আমার ওপর।

শোনো, নিরো। যে উদ্দেশ্যই এসে থাক, ভুলে যাও সব। তোমার ভালর জন্যেই বলছি। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও তুমি। এর মধ্যে তোমার কোন স্বার্থ রক্ষা হবে না।

অসম্ভব, বলল নিরো। আপনি এসব বুঝবেন না।

বুঝি, নিরো। সত্যিই বুঝি। এই একই পথের এ মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত আসা যাওয়া করেছি আমি কয়েকবার, এর। ভালমন্দ সব জানি। এরপর কাতর কণ্ঠে বললাম, তোমার কোন ক্ষতি হোক, তা চাই না, নিরো। আমি হয়ত নিজেকে নিয়েই এত ব্যস্ত থাকব যে তোমার দিকে খেয়াল দিতে পারব না...

নিজেকে রক্ষা করতে জানি আমি। দয়া করে আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে ওর।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা। বুঝতে পারছি, ভাবাবেগ এবং সময় দুটোই অযথা ব্যয় করছি আমি। ওর বয়সে আমার সাথে কেউ যদি এভাবে কথা বলত তাকে আমিও অর্থব্ভ ভাবতাম।

ঠিক আছে, নিরো, মৃদু কণ্ঠে বললাম ওকে, এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলছি না তোমাকে। কিন্তু একথা ঠিক তোমার কিছু হলে। খারাপ লাগবে আমার।

ভাববেন না, কিছুই হবে না আমার। ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এল নিরো। সরল, সুন্দর হাসিতে ভরে উঠল আবার তার মুখ। যাই হোক, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

দ্বীপটার কথা কি বলবে বল।

কেবিনের চারদিকে তাকাল নিরো, তারপর প্রস্তাব করল, চলুন, ব্রিজে যাই।

খোলা জায়গায় এসে চার্ট টেবিলের উপরের শেলফ থেকে একটা প্যাড আর এক টুকরো পেন্সিল টেনে নিল ও। আমার ধারণা, আফ্রিকার তীর ভূমির ছয় থেকে দশ মাইল দূরে, এবং রোভুমা নদীর মুখ থেকে দশ থেকে ত্রিশ মাইল উত্তরে পাওয়া যাবে দ্বীপটাকে।

এ তো বিশাল একটা এলাকা, নিরো, বললাম ওকে। শুধু এটুকু জানলে ওটাকে খোঁজার কোন মানে হয় না-পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আর কি জানো বল।

আমার চোখে চোখ রেখে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল ও।

তারপর মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল। অবশেষে মনস্থির করে পেন্সিল দিয়ে প্যাডে একটা নিচু দিগন্তরেখা আঁকল। সী লেভেল..., বলল ও, তারপর দিগন্তরেখাটার গা থেকে একটা রেখা তুলে পাশাপাশি উঁচু-নিচু ভঙ্গিতে টেনে নিয়ে চলল, এবং হঠাৎ রেখাটা উঠতে শুরু করল উপরদিকে খাড়াভাবে। রেখাটা আবার নেমেও এল প্রায় খাড়াভাবে। এইভাবে তিনবার। স্পষ্ট তিনটে পর্বতচূড়া ঝাঁকেছে নিরো, বুঝতে অসুবিধে হল না। বলল, কাঠামোটা সাগর থেকে এই রকম দেখতে হবে। পাহাড় তিনটে ভলক্যানিক ব্যাসাল্ট, ঘাস বা গাছপালা নেই বললেই চলে, শুধুমাত্র পাথর।

দি ওল্ড মেন..., দেড় জোড়া বুড়োকে দেখেই চিনেছি আমি। কিন্তু হিসেবে ভুল আছে তোমার, নিরো। তীর থেকে কমপক্ষে বিশ মাইল দূরে ওগুলো।

কিন্তু মেইন ল্যাণ্ড থেকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে তো? দ্রুত জানতে চাইল ও। দৃষ্টিসীমার মধ্যে হতে হবে...

তা হবে। পাহাড়ের মাথা থেকে অনেকদূর দেখতে পাওয়া যায়।

আমার চোখে চোখ রেখে প্যাড থেকে স্কেচ আঁকা কাগজটা ছিড়ে নিল নিরো। সেটাকে টুকরো টুকরো করল যত্নের সাথে, তারপর ফেলে দিল হারবারে। নদী থেকে কতটা উত্তরে?

ষাট থেকে সত্তর মাইলের মধ্যে।

চিন্তিত দেখলাম নিরোকে। একটু পর মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, হ্যাঁ, তাই হবে-তাই হওয়া উচিত, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসল একটু। মিলে যাচ্ছে। কিন্তু নির্ভর করছে কতক্ষণ লাগবে আমাদের... একটু থেমে প্রশ্নটা সরাসরি করল আমাকে, ..ওখানে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন, স্কিপার?

পারব। কিন্তু অনেক দূরের পথ। বোটে রাত কাটাবার জন্যে তৈরি হয়ে এলে সবচেয়ে ভাল হয়।

ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসছি, ব্যস্ত এবং উত্তেজিতভাবে নেমে গেল নিরো। কিন্তু জেটিতে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রিজের দিকে তাকাল আবার সে। বলল, দ্বীপটা সম্পর্কে...কি রকম দেখতে বা কি নাম ইত্যাদি বিষয়ে ওদের সাথে আলোচনা করবেন না-ও. কে?

ঠিক আছে, নিরো, আশ্বাস দিয়ে বললাম। যাও তুমি।

অ্যাডমিরালটি চার্ট দেখার জন্যে নিচে নেমে এলাম আমি। ব্যাসাল্ট পাথরের শৈলশিরার মধ্যে দ্য ওল্ড মেন পর্বতশৃঙ্গগুলো সবচেয়ে উঁচু। আফ্রিকার মেইনল্যান্ডের সাথে সমান্তরালভাবে দীর্ঘ দুশো মাইল বিস্তার এই রীফের। পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রীফটা, কিন্তু খানিক পর পর আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ছড়ানো ছিটানো প্রবাল দ্বীপ, বালি-দ্বীপ এবং মগ্নচড়ার বিশৃঙ্খলতার মধ্যে এর উপস্থিতি প্রকট। দি ওল্ড মেন বসবাসের অনুপযোগী। পানি নেই ওখানে। ওগুলোকে ঘিরে রীফের ভিতর। দিয়ে কয়েকটা গভীর চ্যানেল রয়েছে। যে এলাকা জুড়ে নিয়মিত আসা যাওয়া আমার, তার চেয়ে অনেক উত্তরে জায়গাটা, তবে গত বছর একদল বায়োলজিস্টকে নিয়ে ওখানে যেতে হয়েছিল আমাকে।

ওল্ড মেনের উল্টো দিকের একটা দ্বীপে তিন দিনের জন্যে। তবু গেড়েছিলাম আমরা। ঘেরা খাড়িতে সব আবহাওয়ার উপযোগী একটা অ্যাক্টোরেজ আছে ওখানে। পামগাছের মাঝখানে জেলেরা একটা কুয়া তৈরি করে রেখেছে, লবণাক্ত হলেও তার পানি খাওয়া যায়। অ্যাক্টোরেজে দাঁড়িয়ে চ্যানেলের ওপারে দ্য ওল্ড মেন-এর কাঠামো ঠিক নিরো যেভাবে ঐকেছে সেই রকম দেখতে লাগে। সেজন্যেই দেখা মাত্র চিনতে পেরেছি আমি।

আধঘন্টা যেতে না যেতেই গোটা দল এসে হাজির। ট্যাঙ্কির। মাথায় রশি দিয়ে বাঁধা এবং সবুজ ক্যানভাস দিয়ে মোড়া। মোটাসোটা কিছু, হয়ত কোন ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছে। এটাকে বয়ে আনার

জন্যে দ্বীপের দুজন বেকার যুবককেও ধরে আনতে ভুল করেনি। যার যার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে এদেরকে অনুসরণ করছে ওরা তিনজন।

ধরাধরি করে ফোরডেকে নিয়ে এসে নামিয়ে রাখল ওরা ক্যানভাস মোড়া জিনিসটা। কিছুই জানতে চাইলাম না আমি। প্যানথারের কপালে এবং নাকের পাশে আঁচড়ের কয়েকটা দাগ লক্ষ করলাম। সাদা ক্রীম লেপে সেগুলোকে চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ও। হোটেল হিলটনের মারিয়াকে মারধোর করেছে ও, কথাটা ভুলিনি। মারিয়া আর কিছু না পারুক, নখ দিয়ে ওর মুখ আঁচড়ে দিয়েছে বুঝতে পেরে একটু খুশি লাগল। চোখাচোখি হতে হাসলাম আমি। তোমাকে আবার মারল কে হে?

আমার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে ধীরে ধীরে বসল প্যানথার ফাইটিং চেয়ারে। জবাব দিল না দেখে আবার বললাম, যা সুন্দর লাগছে তোমাকে, ইচ্ছা করলেই বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে পার।

শেষ চুমুক দিয়ে খালি বিয়ারের ক্যানটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে, একটানে পিস্তল বের করে টাগেট প্র্যাকটিস করল। ফুটো ক্যানটা ছিটকে চলে গেল জলকুমারীর বাইরে, তারপর পানিতে পড়ল। আমার দিকে ফিরে নিঃশব্দে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সে। কথা বলল না।

সারাটা পথ একের পর এক বিয়ার খেল সে, এবং প্রতিটি ক্যানে গুলি লাগাল অব্যর্থভাবে।

দুপুরে নিরোকে হুইল দিয়ে ডেকের নিচে নামলাম। কেবিনেট খুলে জিনের বোতল নিয়ে বসে আছে দেখলাম ব্লাঙ্ক।

আর কতদূর? জানতে চাইল সে। হরদম মদ খাচ্ছে বলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনে বসেও ঘামছে। এর জন্যে ভুগতে হবে তাকে।

আর দেড়-দুই ঘন্টা।

সুযোগ বুঝে নর্দার্ন টাইড চ্যানেলের ভিতর দিয়ে যাবার প্রসঙ্গ তুলে আরও তিনশো ডলার খসালাম ওর পকেট থেকে।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদে সামনেটা ঝাঁপসা। দি ওল্ড মেন-এর মাথা। তিনটে কালো ভূতের মুণ্ডুর মত বিচ্ছিন্ন দেখাচ্ছে, চ্যানেলের ওপর ঝুলছে যেন। চোখে বিনকিউলার তুলে চূড়া তিনটে পরীক্ষা করছে নিরো, অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর বিনকিউলার নামাল সে, আমার দিকে ফিরে সানন্দে হাসল। ছুটে ককপিটে নেমে যাবার। আগে বলল, মিলে গেছে, স্কিপার!

ফোরডেকের উপর দিয়ে দ্রুত এগোল ওরা, ক্যানভাসে ঢাকা কার্গোটাকে পাশ কাটিয়ে রেলিংয়ের সামনে দাঁড়াল পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে। দ্বীপটার দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে। আছে।

উজান স্রোতের অনুকূলে চ্যানেল পেরোচ্ছে জলকুমারী, ঠিক করেছি এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ওল্ড মেনের পুবপ্রান্তে। পৌঁছুবার চেষ্টা করব এবং সবচেয়ে কাছের চূড়াটার নিচের সৈকতে বোট ভিড়াব। এই উপকূল ভরাজোয়ারের সময় সতেরো ফুট তলিয়ে যায়, তাই অগভীর পানিতে যেতে নেই। বোকামি করে কেউ যদি যায়, ভাটার সময় বোটের নিচ থেকে পানি সরে যাবার পর আবিষ্কার করবে শূন্য জায়গায় উঠে বসে আছে তার বোট।

আমার হ্যাণ্ড-বিয়ারিং কম্পাসটা চেয়ে নিয়ে নিরো সেটা প্যাকেটে ভরল তার চার্ট, পানি ভর্তি থারমস আর এক বোতল সল্ট ট্যাবলেটের সাথে। সন্তর্পণে বীচের দিকে এগোচ্ছি জলকুমারীকে নিয়ে, ওদিকে নিরো আর ব্ল্যাক্স জুতো ও ট্রাউজার। খুলে তৈরি হচ্ছে। সাদা বালিতে বোটের কীল ধাক্কা খেতেই চিৎকার করে বললাম, ও. কে.-নেমে পড়ো এবার।

রেলিং টপকাল নিরো। মই বেয়ে নেমে যাচ্ছে সে। তাকে। অনুসরণ করছে ব্ল্যাক্স। ওদের বগল পর্যন্ত ডুবে গেল পানিতে। মাথার উপর হ্যাভারসাকটা তুলে নিয়ে বীচের দিকে এগোচ্ছে নিরো।

দুঘন্টা! হাঁক ছেড়ে জানিয়ে দিলাম ওদেরকে। তার বেশি দেরি করলে তীরেই ঘুম দিয়ে। ভাটার সময় তোমাদেরকে তুলতে আসব না আমি।

হাত নেড়ে হাসল নিরো। জলকুমারীকে সাবধানে পিছিয়ে আনার সময় দেখলাম পায়ে ট্রাইজার গলিয়ে নিয়ে পামগাছের ভিতর দিয়ে হাঁটছে ওরা। একটু পরই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানিতে দশ মিনিট ঘোরাঘুরি করে যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেলাম। পানির তলায় গাঢ় ছায়া মত দেখে জলকুমারীকে দাঁড় করলাম, নিচে নামিয়ে দিলাম একটা হালকা নোঙর।

ভুরু কুঁচকে সারাক্ষণ লক্ষ্য করছে আমাকে প্যানথার। একটা ফেস প্লেট আর একজোড়া দস্তানা পরে নিলাম। সাথে নিলাম ছোট একটা নেট আর ভারী একটা টায়ার লিভার। রেলিং টপকে মই বেয়ে নেমে গেলাম নিচে। উপর দিকে তাকিয়ে দেখি যা ভেবেছি তাই। রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্যানথার আমার দিকে। এ তোমার কক্ষ নয়, বললাম ওকে। পানির চল্লিশ ফুট নিচে একেবারে তলায় দৃষ্টি চলে গেল আমার।

পানিতে ডুব দিয়ে এক দমে জাল ভর্তি ডাবল-শেল সান ক্ল্যাম তুলে আনতে পেরে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলাম আমি। ফোরডেকে বসে খোলস ছাড়লাম ওগুলোর, রডরিকের ভয়ে খালি শেলগুলো পানিতে ফেলে দিয়ে ধুয়ে ফেললাম ডেকটা। তারপর কিচেনে গিয়ে মিষ্টি শাসগুলো একটা স্টু-পটে ওয়াইন, রসুন, লবণ, কাঁচা মরিচ এবং সামান্য শুকনো মরিচ বাটার সাথে রেখে দিলাম। গ্যাসের চুলোটা জ্বালাই ছিল, আগুন কমিয়ে পটটা বসিয়ে দিলাম তাতে, এবং ঢাকনি চাপা দিয়ে বেরিয়ে এলাম ডেকে। রেলিংয়ের কাছ থেকে ফিরে এসে আবার নিজের মসনদে বসেছে প্যানথার। সিগারেট ধরিয়েছে একটা, কিন্তু মুখ দেখে। বোঝা যাচ্ছে মেজাজ ভাল নেই।

বল, মহারথী, কি অসুবিধে হচ্ছে তোমার? যেচে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম ওকে। খুব বুঝি নিরস লাগছে? লাথি মারার জন্যে ছোট একটা মেয়ে পেলে খুশি হও?

চোখ কুঁচকে তাকাল ও আমার দিকে, ভাবছে খবরটা পেলাম কিভাবে। মুখটা বেশি ফাঁক হয়ে গেছে তোমার, রানা। মনে হচ্ছে সেলাই দরকার।

এ-ধরনের মিঠেকড়া বুলি বিনিময় চলল আমাদের মধ্যে,। তাতে চমৎকারভাবে কেটে গেল সময়টা। একসময় দূর সৈকতে। দুটো মূর্তিকে দেখা গেল-চিৎকার করে এবং হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। নোঙর তুলে আবার সন্তর্পণে এগিয়ে নিয়ে চললাম জলকুমারীকে।

বোটে উঠেই প্যানথারকে নিয়ে ফোরডেকে গোপন শলাপরামর্শে বসল ওরা। তিনজনই মহা উত্তেজিত, কিন্তু নিরো একেবারে টগবগ করে ফুটছে। কথা বলছে চাপা স্বরে, কিন্তু সবেগে হাত ছুঁড়ে আর মাথা ঝাঁকিয়ে চ্যানেলের দিকটা বারবার দেখাচ্ছে সে। এই প্রথম কোন বিষয়ে ওদেরকে আমি একমত হতে দেখলাম।

ওদের বৈঠক যখন শেষ হল, আর মাত্র এক ঘন্টা বাকি সূর্য ডুবতে। আলোচনার ফলাফল আমাকে ওরা জানাল না, আমিও কোনরকম কৌতূহল দেখলাম না। কিন্তু দাবির সুরে ব্ল্যাক্স জানাল। আরও কিছুক্ষণ এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে হবে। সরাসরি প্রত্য্যখ্যান করলাম তাকে। বললাম, রাজি নই আমি। অন্ধকারে। ভাটার মধ্যে আটকা পড়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই।

ব্ল্যাক্সের তাকিয়ে থাকাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চ্যানেল পেরিয়ে খাড়ির নিরাপদ অ্যাক্সোরেজে নিয়ে এলাম জলকুমারীকে। লাল টকটকে দিগন্তরেখার নিচে সূর্য ডোবার ঠিক আগেভাগে ভারী দুটো নোঙর ফেলে বোটটাকে শান্ত করলাম, নিজেকে বিশ্বাস দেবার জন্যে দিনের শেষ এবং সন্ধ্যার প্রথম স্ফচ নিয়ে বসলাম ব্রিজে। নিচের সেলুনে আবার শুরু হয়েছে ওদের আলোচনা। উৎসাহ নেই, তাই আড়ি পেতে শোনার জন্যে ভেন্টিলেটরের কাছে গেলাম না। খাড়ি পেরিয়ে মশাদের প্রথম দলটা পৌঁছে যখন কানের কাছে সুর ভাঁজতে শুরু করল, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম আমি, নিচে নেমে কেবিনে পা দিতেই আচমকা সবাই মৌত অবলম্বন করল।

জুস, পাইন অ্যাপলের সালাড, বেক করা বীফ-এর সাথে স্টুপ্যানের ক্ল্যাম মিশিয়ে পরিবেশন করলাম। চুপচাপ চার বোবায় খাওয়া শেষ করলাম। সবশেষে শুধু নিরো একটা কথা বলল। তার মৃদু কণ্ঠ ব্রাশ ফায়ারের মত বাজল কানে, নিস্তব্ধতা এমনই জমাট বেঁধে গিয়েছিল কেবিনের ভিতর। স্কিপার, আমার বোনের চেয়ে কেউ ভাল রাঁধতে পারে এ আমি বিশ্বাস করতাম না-আজ এক ধাপ নেমে গেল সে।

বঙ্গ ললনাদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আরেকটা দেব কিনা জিজ্ঞেস করলাম না, তবে নিঃশব্দে হাসলাম। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার বোনের রান্না তো তাহলে এক দিন খেয়ে দেখতে হয়।

এবার ব্রাশ ফায়ার নয়, কেবিনে বোমা ফাটতে শুরু করল। হা হা করে হাসছে প্যানথার। তার এই হাসির কারণটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমার।

মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠলাম আমি। জলকুমারীর নোঙর চেক করার জন্যে বেরিয়ে এলাম ডেকে। সব ঠিকঠাক আছে দেখে নিয়ে ফিরতে যাব, এই সময় বাধা দিল আমাকে অকাতরে নেমে আসা ধবধবে চাঁদের আলো।

আমার চারদিকে অদ্ভুত এক মহিমায় উদ্ভাসিত রাতকে দেখতে পাচ্ছি। জলকুমারীর গায়ে স্রোতের পরশ লেগে মৃদু কল কল শব্দ উঠছে, আর অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে আউটার রীফের গায়ে বিধ্বস্ত স্রোতের গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের আওয়াজ। খোলা সাগর থেকে বিশাল বিস্তার এবং আকাশচুম্বী আকার নিয়ে উন্মত্ত গতিতে ধেয়ে এসে বজ্রনির্ঘোষে আছাড় খাচ্ছে চেউ গানফায়ার রীফের কঠিন প্রবাল প্রাচীরের গায়ে। যে-ই রেখে থাকুক নামটা, অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। তলপেট কাঁপানো বুমবুম আওয়াজটা অবিরাম কামানের তোপ দাগার মতই। শোনাচ্ছে।

চাঁদের আলো ঝলমলে রূপালী করে তুলেছে চ্যানেলটাকে, আর ওল্ড মেন-এর বিশাল গম্বুজগুলোকে হাতির দাঁতের মত ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে। ওগুলোর নিচে, খাড়ি থেকে মোচড় আর পাক খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে অশান্ত আত্মার মত রাতের। কুয়াশা।

অকস্মাৎ ক্ষীণ একটা শব্দ শুনে বিদ্যুৎবেগে আধ পাক ঘুরে দাঁড়ালাম। দুই হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্যানথার, শিকারী চিতাবাঘের মত নিঃশব্দে আমাকে অনুসরণ করে এসেছে ও। শুধু। একজোড়া জকি শর্টস পরে আছে। চাঁদের আলোয় শরীরটাকে পেশীবহুল এবং চকচকে দেখাচ্ছে। লম্বা হাতে ধরা পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ অটোমেটিকটা ওর ডান উরুর পাশে। পরস্পরের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলাম। ধীরে ধীরে ঢিল পড়ল আমার পেশীতে।

পিছন থেকে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না তুমি, বললাম ওকে।

এখনও সময় আসেনি। যখন আসবে, সামনেই দেখতে। পাবে আমাকে, চাপা স্বরে, যেন গোপন পরামর্শ করছে আমার। সাথে, বলল ও। অটোমেটিকটা বুকুর সামনে তুলল। তখন তোমার আর

আমার মাঝখানে থাকবে এই মহাজন। তারপর নিঃশব্দে হাসল ও। চাঁদের আলো লেগে ঝিক করে উঠল দাঁতগুলো।

ছয়

সূর্য ওঠার আগে ব্রেকফাস্ট সারলাম আমরা। কফি নিয়ে ব্রিজে উঠে এলাম আমি। চ্যানেলের উপর দিয়ে খোলা সাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জলকুমারী। নিচের সেলুনে সাত সকালেই মদ নিয়ে বসেছে ব্ল্যাক্স, আর প্যানথার তার নির্দিষ্ট ঠিকানা ফাইটিং চেয়ারে আশ্রয় নিয়েছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আজকের দিনের প্রোগ্রাম ব্যাখ্যা করছে নিরো।

উত্তেজনায় ছিলা টেনে ধরা ধনুক হয়ে আছে ও, নাকে প্রথম পাখির গন্ধ নেয়া তরুণ শিকারী কুকুরের মত কাপছে। ওল্ড মেনএর চূড়াগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল সে, ওগুলোর কোনাকুনি অবস্থান এবং দূরত্ব মাপতে চাই আমি, স্কিপার। আপনার হ্যাণ্ড বিয়ারিং কম্পাসটা ব্যবহার করব। যখন যেকোনো যতে হবে সাথে সাথে জানাব আপনাকে।

তার চেয়ে তোমার বিয়ারিং দাও আমাকে, নিরো। হিসেব কষে আমিই তোমাকে নির্দিষ্ট স্পটে পৌঁছে দেব।

অপ্রতিভ দেখাল ওকে। এক সেকেও ইতস্তত করে পরামর্শটা প্রত্যাখ্যান করল। বলল, কাজটা আমার পদ্ধতিতেই হোক।

বিরক্তি চেপে বললাম, বেশ। সাথে সাথে দৌড়ে চলে গেল ও পোর্ট রেইলের কাছে। কম্পাস লেন্সের মধ্যে দিয়ে চূড়াগুলোকে দেখছে গভীর মনোযোগের সাথে। দশ মিনিট পর আবার কথা বলল ও। এখন। আমরা পোর্টের দিকে দুই পয়েন্ট ঘুরতে পারি, স্কিপার?

পারি বৈকি, ওর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছি। কিন্তু তার। ফলে গানফায়ার রীফের শেষ মাথার দিকে আটকা পড়ে যাবে জলকুমারী-এবং ধাক্কা খেয়ে দুফাঁক হয়ে যাবে কীল।

রীফের পেঁচানো গোলকধাঁধায় আরও দুঘন্টা চক্কর খেয়ে অবশেষে একটা পথ তৈরি করে বেরিয়ে আসতে পারলাম খোলা। সাগরে। ঘুরপথে এখন আবার ফিরে যাচ্ছি পূর্ব দিক থেকে গানফায়ার রীফের কাছে পৌঁছবার জন্যে।

ঠিক কোথায় পৌঁছুতে চাইছে তা বলছে না নিরো। একটু একটু করে সুতো ছাড়ছে ও। ফলে গোটা সমস্যাটা একসাথে। দেখার সুযোগ নেই আমার।

বাইরের দিকে স্রোত এখানে সংগ্রামী জনতার বিশাল। মিছিলের মত এগোচ্ছে মেইন ল্যাণ্ডের দিকে। ক্রমশ উঁচু সাগর তলের ঢালে বাধা পেয়ে তা ফুলে-ফেঁপে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। দোল খাচ্ছে জলকুমারী, কিনারা ঘেঁষে আউটার রীফের দিকে এগোচ্ছে সে, বারবার পাক খেয়ে স্রোতের দিকে ফেরার প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠছে তার আচরণে।

প্রবাল প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে স্রোতের ধাবমান মিছিল অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর আক্রোশে বিস্ফোরিত হয়ে অসংখ্য আকাশছোঁয়া স্তম্ভের আকারে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে, উন্মত্ত গতিতে পাঁচিল টপকে ওপারে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে-তার গগনবিদারী আওয়াজ কয়েক মাইল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে বাতাসকে। নিচে চাপা পড়া মিছিলের অংশটা ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, সাদা ফেনার পাহাড়ে পরিণত হয়ে পিছিয়ে আসার সময় মুহূর্তের জন্যে দেখা। যাচ্ছে প্রাচীরের বিশাল কালো ফণার বিস্তার। ইতিমধ্যে সাগর তলের ঢালে বাধা পেয়ে ফুলে-ফেঁপে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসতে শুরু করেছে পরবর্তী স্রোতের মিছিল।

নিরো আমাকে একটানা দক্ষিণ-ঘেঁষা দিক-নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ রীফের কাছাকাছি কোন স্পটের দিকে পৌঁছুতে চাইছে ও। লক্ষণ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছি ওর লক্ষ্যস্থলের খুব কাছে চলে এসেছি আমরা। কম্পাস-লেন্সের ভিতর দিয়ে ব্যগ্রভাবে একবার একটা তারপর আরেকটা চূড়ার দিকে বারবার তাকাচ্ছে নিরো।

বোট সোজা রাখুন, স্কিপার, কাপা গলায় আবেদন জানাল ও। ওই হেডিংয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান।

ভয়াল প্রবালের দিক থেকে দৃষ্টি ছিড়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে সামনে তাকালাম আমি। পিঠ উঁচু করে পরবর্তী স্রোতের মিছিল হামলা চালাতে যাচ্ছে। বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল সেটাকিন্তু পাঁচশো গজ সামনের একটা সরু পয়েন্টে স্রোতটাকে ভেঙে পড়তে না দেখে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আমার দৃষ্টি। দেখলাম লাফ দিয়ে শূন্যে না চড়ে স্রোতটা অখণ্ডভাবে ছুটছে ল্যাণ্ড-এর দিকে। এর দুদিকের প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হচ্ছে স্রোত, কিন্তু মাঝখানের এই পয়েন্টে একটা ফাঁক দিয়ে নির্বাধায় প্রবেশ করছে পানির তোড়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রডরিকের একটা বর্ণনার কথা। যেভাবে বলেছিল আমাকে, পরিষ্কার মনে পড়ে গেল আমার, এখনও কানে বাজছে ওর উচ্চারণ ভঙ্গি।

বুঝলে, মাসুদ, উনিশ বছর বয়সে গানফায়ার ব্রেক-এর গর্ত থেকে আমার প্রথম জু-ফিশ ধরি আমি। সেই থেকে আর কেউ আমার সাথে মাছ ধরতে যেতে সাহস পায় না। দোষ নেই। ওদের। গানফায়ার ব্রেকে যাবার মত বোকামি আমি নিজেও আর করব না-এখন বুদ্ধি হয়েছে, ম্যান।

গানফায়ার ব্রেক! হঠাৎ বুঝতে পারলাম জলকুমারীকে নিয়ে গানফায়ার ব্রেক-এর দিকেই এগোচ্ছি আমরা। রডরিকের সম্পূর্ণ বক্তব্যটা স্মরণ করার চেষ্টা করছি আমি।

...জোয়ারের ঘন্টা দুই আগে খোলা সাগরের দিক থেকে এগোচ্ছ তুমি, ফাঁকটার মাঝখান বরাবর সোজা রাখো তোমার বোটের নাক, যতক্ষণ না প্রকাণ্ড একটা প্রবালের মস্ত মাথাকে তোমার স্টারবোর্ডের সাথে সমান্তরাল ভাবে দেখতে পাচ্ছ। দেখলেই চিনতে পারবে ওটা। যতটা পার গা ঘেঁষে পাশ কাটাও ওটাকে, তারপরই বোটের নাক স্টারবোর্ডের দিকে দ্রুতবেগে। ঘুরিয়ে নাও-বাস! নিজেকে তুমি মেইন রীফের পিছনের গায়ে নিখুঁতভাবে তৈরি বিশাল এক গর্তের ভেতর আবিষ্কার করবে। যতটা গর্তের পিছনের দেয়াল ঘেঁষে থাকবে ততই নিরাপদ তুমি, ম্যান... স্পষ্ট মনে পড়ছে সব, লর্ড নেলসনের পাবলিক বারে। বসে তার এই অভিজ্ঞতার কথা বলছিল রডরিক। সবাই বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তার কথা শুনছিল। সেন্ট মেরী দ্বীপে একমাত্র সে-ই দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়ে গানফায়ার ব্রেক পেরিয়েছে। যত ভারী নোঙরই ফেলো তুমি, তোমার বোটকে ওখানে ধরে রাখতে পারবে না। বোটকে ফাঁকটার মধ্যে স্থির রাখার জন্যে স্টীল রডের বৈঠার উপর ঝুঁকে পড়তে হবে তোমাকে-গানফায়ার ব্রেকে গর্তটা গভীর, ম্যান, খুবই গভীর; আর জু-ফিশগুলো ওখানে প্রকাণ্ড। একদিন তো আমি চারটে মাছ ধরলাম, সবচেয়ে ছোটটার ওজন ছিল তিনশো পাউণ্ড। আরও নিতে পারতাম-কিন্তু সময় হয়ে। গিয়েছিল। জোয়ারের পর গানফায়ার ব্রেকে তুমি এক ঘন্টার বেশি থাকতে পার না। পানি একবার নামতে শুরু করলে কার বাপের সাধি ওখানে টেকে-সড়াং করে টান দেয় সাগর, বিদ্যুৎবেগে সব পানি ব্রেক-এর মধ্যে দিয়ে লাফ মেরে পড়ে তার পেটে। যে পথে ঢুকেছ সেই পথ দিয়েই বেরুতে হবে তোমাকে। শুধু আগের চেয়ে একটু সাবধান হবে তুমি, কারণ ফেরার সময়। তোমার বোটে একটন মাছ আর তোমার কীলের নিচে দশ ফুট। কম পানি রয়েছে। রীফের পেছন

দিকের একটা চ্যানেল ধরে বেরুবার আরেকটা পথ আছে বটে, কিন্তু ওটার কথা আমি এমন কি আলোচনাও করতে চাই না। মাত্র একবার ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিলাম।

নিরোর বিয়ারিং জলকুমারীকে এখন স্পষ্টই গানফায়ার ব্রেকএর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

যথেষ্ট হয়েছে, নিরো, গম্ভীরভাবে বললাম ওকে। এর বেশি এগোচ্ছি না আমরা। থ্রটল খুলে দিলাম, কোর্স বদলে বোটের নাক দিগন্তরেখার দিকে ঘুরিয়ে নিলাম। তারপর ফিরলাম নিরোর দিকে।

এ আপনি কি করলেন! রাগে চাঁচিয়ে উঠল নিরো। প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা-আরও একটু যেতে পারতাম না?

তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে, নিরো? ককপিট থেকে ভ্রঙ্কার ছেড়ে জানতে চাইল প্যানথার।

না, ঠিক আছে সব, চাঁচিয়ে উত্তর দিল নিরো, তারপর ঝট করে আমার দিকে ফিরে রাগে ফেটে পড়ল। এ আপনার অন্যায়, স্কিপার। আপনার সাথে চুক্তি হয়েছে...।

তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই, নিরো... চার্ট টেবিলে নিয়ে গেলাম ওকে। অ্যাডমিরালটি চার্টে ব্রেক-এর কাছে পানির গভীরতা উল্লেখ করা হয়েছে ত্রিশ ফ্যাদম, কিন্তু এর কোন নাম বা সেইলিং ইন্সট্রাকশন দেয়া হয়নি। ব্রেক থেকে ওল্ড মেনের সর্বোচ্চ চূড়া দুটোর বিয়ারিং পেঙ্গিলের দাগ টানলাম দ্রুত, তারপর প্রোড্রাক্টর (রেমরটর্ডমর) দিয়ে মাপলাম সদ্য তৈরি কোণটাকে।

কারেক্ট? জানতে চাইলাম আমি।

আমার লেখা সংখ্যাটার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে নিরো।

ঠিক ধরেছি, তাই না?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে সাই দিল নিরো। হ্যাঁ, বলল ও, ওখানেই যেতে চাই।

গানফায়ার ব্রেক-এর কথা বিশেষভাবে জানালাম ওকে।

কিন্তু ওখানে আমাদেরকে যেতেই হবে, আমি থামতেই ব্যাকুল কণ্ঠে বলল ও, যেন আমার একটা কথাও কানে ঢোকেনি। ওর।

উপায় নেই, দুঃখিত, বললাম ওকে। সেন্ট মেরী দ্বীপের। গ্র্যাণ্ড হারবার ছাড়া আর কোথাও যেতে আগ্রহী নই আমি। কোর্স। বদলে জলকুমারীর নাক সেদিকেই ঘুরিয়ে দিলাম। যতদূর বুঝতে পারছি, চুক্তি বাতিল হয়ে গেল।

মই বেয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেল নিরো। সদলবলে ফিরে এল দুই মিনিটের মধ্যে। ব্ল্যাককে অস্বাভাবিক গন্তীর দেখাচ্ছে, আর। রাগে ফুঁসছে প্যানথার।

একবার শুধু হ্যাঁ বলো, ওস্তাদ, তারপর দেখ বানচোতের হাত ছিড়ে নিয়ে ভিজে দিকটা দিয়ে পিটিয়ে কেমন লাশ বানিয়ে ফেলি! শার্টের আঙ্গিন গুটাচ্ছে প্যানথার।

ছেলেটা বলছে তুমি নাকি ফিরে যাচ্ছ? জানতে চাইল ব্ল্যাক। এ তো ভাল কথা নয়!

গানফায়ার ব্রেক-এর বিপদটা আবার একবার ব্যাখ্যা করলাম, শুনেই চুপসে গেল ওরা।

আমাকে আপনি যতটা সম্ভব কাছাকাছি নিয়ে চলুন, বাকিটা। আমি সাঁতরে পেরোবো, আবেদন জানাল নিরো।

ব্ল্যাকের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলাম, সেক্ষেত্রে ওকে আপনার হারাতে হবে। সে-ঝুঁকি নেবেন আপনি?

উত্তর দিতে পারল না ব্ল্যাক। জানি, নিরো তার কাছে প্রশ্ন পাথরের মতই দামি। অন্তত এখনও।

চেষ্টা করে দেখতে দিন আমাকে, জেদের সাথে বলল নিরো।

অস্বস্তির সাথে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করল ব্ল্যাক।

ব্রেকে যদি ঢুকতে না পারি, অন্তত স্লেজের সাথে আমাকে একবার রীফ বরাবর টেনে নিয়ে চলুন, তখনও বলে চলেছে নিরো। ফোরডেকে সবুজ ক্যানভাস মোড়া জিনিসটা কি এখন বোঝা গেল। রীফের সামনের কিনারা বরাবর ব্রেকে ঢোকার মুখ ছাড়িয়ে মাত্র দুবার টেনে নিয়ে গেলেই চলবে, আমি আর কিছুই চাই না... করুণ সুরে ভিক্ষা চাইছে এখন নিরো।

প্রম্ববোধক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ব্ল্যাক্স। আমি জানি, প্রবাল প্রাচীরের গা ঘেঁষে, মাত্র কয়েক গজ দূরে থেকে বোট চালাতে পারব কোন ঝুঁকি না নিয়েই। কিন্তু ঝোপ বুঝে কোপ মারার এই সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া করার ইচ্ছে নেই আমার। চেহারা উদ্বেগ ফুটিয়ে তুললাম, তারপর বললাম, সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে হবে আমাকে, শ্রাগ করলাম, ঠিক আছে, ডেঞ্জার মানি পেলো...

ডেঞ্জার মানি হিসেবে অগ্রিম দেয়া আরও পাঁচশো ডলার খসিয়ে আনলাম ব্ল্যাক্সের পকেট থেকে। আমরা যখন ব্যবসা করছি, ফোরডেকে ক্যানভাসের আবরণ খুলে স্লেজটা বের করতে নিরোকে সাহায্য করছে তখন প্যানথার। ধরাধরি করে ককপিটে নিয়ে এল ওরা সেটাকে।

নোটের বাণ্ডিলটা সরিয়ে রেখে ফিরে এলাম আমি। টানার জন্যে স্লেজটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে।

স্টেনলেস স্টীল আর প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা স্লেজটাকে একনজর দেখেই বুঝলাম য, মেধা এবং টাকা কোনটাই কম খরচ করা হয়নি এর পিছনে। স্নাে রানারের বদলে এর রয়েছে। চোখা ফিন কন্ট্রোল, রাডার এবং হাইড্রোফয়েল, এগুলো অপারেট করার জন্যে পাইলট শিল্ডের নিচে ছোট একটা জয়স্টিক দেখা যাচ্ছে।

স্লেজ-এর নাকে একটা আংটা পরানো রয়েছে, দড়ির একটা প্রান্ত বাধা হবে ওটায়, অপর প্রান্তটা থাকবে বোটে, স্লেজটাকে টেনে নিয়ে যাবে সে। ট্রান্সপারেন্ট শিল্ডের পিছনে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে নিরো, স্লেজের চেসিসে তৈরি করা জোড়া ট্যাঙ্ক থেকে অক্সিজেন নেবে ও। ড্যাশবোর্ডে রয়েছে ডেপথ আর প্রেশার গজ, দিক নির্দেশক কম্পাস আর টাইম ইল্যাপস্ ক্লক। জয়স্টিকের সাহায্যে ডাইভের গভীরতা কন্ট্রোল করতে পারবে নিরো। তাছাড়া প্রয়োজনে জলকুমারীকে সোজাসুজি অনুসরণ না করে অনেকটা ডান বা বাম দিকে সরে যেতেও পারবে।

খুবই সুন্দর জিনিস, মন্তব্য করলাম।

একটু লজ্জা পেল নিরো। বলল, ধন্যবাদ, স্কিপার-আমার নিজের হাতে তৈরি।

মোটা রাবারের স্যুট পরল নিরো। হুডটা আটকে নিচ্ছে। মাথায়। এই সুযোগে ঝুঁকে পড়ে স্লেজের চেসিসে মেজারস প্লেটটা দেখে নিলাম আমিঃ

Built by Neros Underwater World

5 Pavillion Arcade

Brighton, Sussex

হুডের ফোকরে নিরোর মুখটা বেরিয়ে আসছে, এই সময়। সিধে হয়ে দাঁড়ালাম আমি। একবার দেখেই নাম এবং ঠিকানা মুখস্থ হয়ে গেছে আমার।

স্লেজ টানার জন্যে ফাইভ নট যথেষ্ট স্পীড, স্কিপার, বলল ও। রীফ থেকে আপনি যদি একশো গজ দূরত্ব বজায় রাখেন, বাইরের দিক থেকে প্রবালের দেহরেখা অনুসরণ করতে পারব আমি।

ও. কে।

পানির নিচে থেকে আমি যদি হলুদ মার্কার ছাড়ি, গুরুত্ব দেবেন না-পরে ওটার কাছে আবার আমরা ফিরে যাব। কিন্তু আমি যদি লাল মার্কার ছাড়ি, বিপদে পড়তে যাচ্ছি বলে মনে করবেন-সাথে সাথে রীফ থেকে বের করে টেনে তুলে নেবেন আমাকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সাই দিলাম, তিন ঘন্টা সময় আছে তোমার, সাবধান করে দিলাম ওকে। ব্রেক-এর মধ্যে দিয়ে ভাটার পানি নামতে শুরু করলে সরে যেতে হবে আমাদেরকে।

তিন ঘন্টা যথেষ্ট সময়।

আমি আর প্যানথার ধরাধরি করে বোট থেকে নামালাম স্লেজটাকে, খানিকটা ভুবে গিয়ে পানিতে ভাসছে সেটা। ব্যস্তভাবে নেমে গেল নিরো। স্লেজে উঠে স্ক্রীনের পিছনে পজিশন নিল ও। কন্ট্রোল পরীক্ষা করছে, শেষবারের মত অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে ফেস-প্লেট। তারপর অক্সিজেন ট্যাঙ্কের সাথে যুক্ত মাউথ পীসটা মুখে পুরে নিয়ে বুড়ো আঙুল খাড়া করে সিগন্যাল দিল আমাকে।

দ্রুত ব্রিজে উঠে এসে থ্রটল খুলে দিলাম। বোটে গতি সঞ্চার হল, সেই সাথে স্টার্নে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে মোটা নাইলনের রশি ফেলে দিচ্ছে প্যানথার, ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। স্লেজটা। একশো পঞ্চাশ গজ রশি ফেলার একটু পর টান লেগে ঝাঁকি খেল সেটা, তারপর জলকুমারীকে অনুসরণ করতে শুরু করল স্লেজ।

আমাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল নিরো। ধীরে ধীরে স্পীড বাড়িয়ে ফাইভ নট পর্যন্ত তুললাম আমি। বিশাল একটা বৃত্ত রচনা করে কিনারা ঘেঁষে এগোচ্ছি রীফের দিকে, বিশাল স্রোতের মিছিল জলকুমারীর পেটে গুতো মারছে, বিপজ্জনকভাবে একদিকে কাত হয়ে আছে সে।

আরেকবার হাত নাড়ল নিরো। স্লেজের কন্ট্রোল কলাম সামনের দিকে ঠেলে দিল ও। স্লেজের কন্ট্রোল ফিন বরাবর উথলে উঠল পানি, সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে আলোড়নের মধ্যে, তারপর হঠাৎ স্লেজটা নাক নিচু করে ডুব দিল পানির নিচে। দ্রুত এবং ঘন ঘন এদিক ওদিক সরে গিয়ে দিক বদল করছে নাইলনের রশিটা, তারপর স্লেজটা একেবারে নিচে নেমে গেল, রশিটা এখন দ্রুত সরে যাচ্ছে রীফের দিকে।

জোর টান পড়ায় রশিটা সদ্য গাঁথা তীরের মত কাপছে থরথর করে, গা ঝাড়া দিয়ে পানি ছিটাচ্ছে। রীফ-এর সাথে। সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে জলকুমারী, ক্রমশ কাছে চলে আসছে। ব্রেক। প্রবালের দিকে সতর্ক, সমীহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। আমি, সংঘর্ষের কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি নিরোকে, পানির অনেক নিচে দিয়ে তলা ঘেঁষে নিঃশব্দে ছুটে আসছে, এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে দ্রুত জলমগ্ন প্রবাল প্রাচীরগুলোকে এড়াবার জন্যে। সন্দেহ নেই, রোমাঞ্চ অনুভব করছে নিরো। একটু ঈর্ষা হল আমার। ঠিক করলাম, সুযোগ। পেলে ওই স্লেজে চাপব একবার।

ব্রেক-এর উল্টোদিকে এলাম আমরা, পাশ কাটলাম, এবং ঠিক তখুনি প্যানথারের চিৎকার শুনতে পেলাম আমি। দ্রুত স্টার্নের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখি পিছনে ফেলে আসা বোটের তৈরি মসৃণ

পানিপথে বড় একটা হলুদ রঙের বেলুন ভেসে উঠেছে। রশির মাথায় ভাসছে ওটা, শেষ প্রান্তের ভারী সীসাটা। তলায় পড়ে আছে।

পেয়েছে! কিছু পেয়েছে! চিৎকার করছে প্যানথার।

রীফের সাথে সমান্তরালভাবে আরও সিকি মাইল এগিয়ে এলাম আমরা। এই সময় নাইলনের রশিতে ঢিল পড়ল এবং অশান্ত পানির উপর মাথা তুলে ভেসে উঠল স্লেজটা।

রীফের দিকে পিছন ফিরে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনলাম। বোট, তারপর স্লেজটাকে তোলার জন্যে প্যানথারকে সাহায্য। করতে নিচে নেমে এলাম।

ককপিটে উঠে এল নিরো। ফেস-প্লেট খুলে ফেলতেই দেখলাম ঠোঁট জোড়া অদম্যভাবে কাঁপছে ওর, চোখ দুটো বিস্ময় এবং আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। ব্ল্যাক্‌সের কজি চেপে ধরে নেশাগ্রস্ত। মাতালের মত তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল কেবিনের ভিতর। রডরিকের প্রিয় ডেকটাকে সাগরের পানিতে একেবারে নাইয়ে দিল ও।

আমি আর প্যানথার রশি গুটিয়ে স্লেজটাকে তুলে নিলাম। ককপিটে। এরপর ব্রিজে ফিরে এলাম আমি, কোর্স বদলে মন্থর গতিতে ফিরে যাচ্ছি গানফায়ার ব্রেক-এর মুখের দিকে।

ওখানে পৌঁছুবার আগেই ব্ল্যাক্স আর নিরো উঠে এল ব্রিজে। এখন ব্ল্যাক্সকেও সাংঘাতিক উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

ছেলেটা এবার একটা উদ্ধার প্রচেষ্টা চালাতে চায়।

কি উদ্ধার করবে নিরো তা আর আমি জিজ্ঞেস করলাম না। শুধু জানতে চাইলাম, সাইজ কি? তারপর হাতটা চোখের সামনে তুলে রিস্টওয়াচ দেখলাম। ব্রেক থেকে পানি বেরিয়ে আসা শুরু হতে দেড় ঘন্টা বাকি আছে আর।

খুব বড় নয়... আশ্বাস দিয়ে বলল নিরো। পঞ্চাশ পাউণ্ড, তার বেশি হবে না।

ঠিক জানো? ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম। ওজন বেশি হলে—

বেশি নয়, যীশুর কিরে...

জিনিসটা যাই হোক, ওটায় তুমি এয়ারব্যাগ বাঁধতে চাও, তাই না?

হ্যাঁ। এয়ারব্যাগের সাহায্যে পানির ওপরে তুলতে চাই, তারপর রীফ থেকে টেনে নিয়ে আসা যাবে।

ব্রেক-এর চোয়ালের কাছে লাফালাফি করছে হলুদ বেলুনটা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বোট নিয়ে এগোচ্ছি ওটার দিকে। আর এগোচ্ছি না আমি, আমার চিংকার শুনে ককপিট থেকে হাত নেড়ে তাতেই রাজি হল নিরো। রাবারের ফ্লিপার পায়ে গলিয়ে নিয়ে হেঁটে স্টার্নের দিকে এগোচ্ছে সে। কিনারায় দাঁড়িয়ে ইকুইপমেন্টগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে। সাথে দুটো এয়ারব্যাগ এবং স্লেজ ঢাকার সবুজ ক্যানভাসটা নিয়েছে ও, নাইলনের কুণ্ডলী পাকানো রশির একটা প্রান্ত দিয়ে বেঁধে নিয়েছে নিজেকে।

কজির সাথে আটকানো কম্পাসের সাহায্যে হলুদ মার্কারের বিয়ারিং নিল ও, আবার একবার ব্রিজের দিকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তারপর স্টার্নের কিনারার দিকে পিছন ফিরে চিং হয়ে পড়ে গেল, ঝপাৎ করে পিঠ দিয়ে পড়ল পানিতে, অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নিচে। ওর নিয়মিত নিঃশ্বাস একরাশ সাদা বুদবুদ হয়ে ভেসে উঠল পানির উপর, স্টার্নের নিচে। পানির তলা দিয়ে রীফের দিকে এগোচ্ছে ও, বোঝা যাচ্ছে নতুন। বুদবুদগুলোকে সেদিকে এগোতে দেখে। ওর পিছনে নাইলনের। বডিলাইন ছেড়ে যাচ্ছে প্যানথার।

ঘন ঘন আগুপিছু করে একই জায়গায় বোটটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করছি আমি। ব্রেক-এর দক্ষিণ প্রান্ত থেকে একশো গজ দূরে রয়েছে আমরা। ধীরে ধীরে নিরোর বুদবুদগুলো হলুদ মার্কারের দিকে এগোচ্ছে। তারপর ওটার পাশে গিয়ে থামল সেগুলো। বেলুনটার নিচে কাজ করছে নিরো। বুঝলাম খালি এয়ারব্যাগের স্ট্রাপ দিয়ে সাগর তলায় পাওয়া জিনিসটা বাঁধছে সে। কাজটা কঠিন। স্রোতের তোড়ে মোটাসোটা ব্যাগগুলোকে স্থিরভাবে ধরে রাখা সহজ নয়। স্ট্রাপ দিয়ে বাঁধার পরও বাকি থাকবে কাজ। স্কুবা বটল থেকে ব্যাগে ভরতে হবে কমপ্রেসড এয়ার। রহস্যময় জিনিসটার আকার

এবং ওজন সম্পর্কে নিরোর অনুমান যদি সঠিক হয়, তলা থেকে ওটাকে তুলতে খুব বেশি টানের দরকার হবে না, এবং একবার ওটাকে নিচের ঝামেলা থেকে মুক্ত করে তুলতে। পারলে নিরাপদ জায়গায় টেনে নিয়ে এসে বোটে তোলা কোন সমস্যাই নয়।

চল্লিশ মিনিট ধরে জলকুমারীকে একই জায়গায় ধরে রেখেছি, এই সময় একেবারে হঠাৎ করে চকচকে দুটো সবুজ এয়ারব্যাগ বোটের পিছনে ভেসে উঠল পানির গা ছুঁড়ে। পরমুহূর্তে সেগুলোর পাশে দেখা গেল নিরোর হুড পরা মাথা। ডান হাত সোজা ওপর দিকে তুলে সিগন্যাল দিল আমাকে ও।

রেডি? চিৎকার করে জানতে চাইলাম আমি।

রেডি! ককপিট থেকে বলল প্যানথার। রশি সামলে নিয়েছে সে।

সাবধানে এবং মন্থর গতিতে জলকুমারীকে নিয়ে রীফের কাছ থেকে সরে আসছি আমরা। পাঁচশো গজ এসে পা দিয়ে লাথি মেরে নিউট্রাল করলাম বোটটাকে, তারপর এগোলাম সাঁতারু আর তার সবুজ এয়ারব্যাগগুলোকে টেনে তুলতে সাহায্য করার জন্যে।

মইয়ের কাছে পৌঁছেছি, এই সময় হুমকি দিয়ে বলল ব্ল্যাক্স, আর এক পা-ও এগিয়ো না!

শ্রাগ করে হুইলের কাছে ফিরে এলাম আমি। ভাবলাম, জাহান্নামে যাক ব্যাটার। লম্বা, কালো চুরুট ধরলাম একটা। কিন্তু যত চেষ্টাই করি, কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না কোনমতে। কি তুলে এনেছে নিরো? বোটের কিনারা ধরে এগোচ্ছে ওরা, ঝুলন্ত এয়ারব্যাগ দুটোকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বোএর দিকে।

বোটে উঠতে সাহায্য করল ওরা নিরোকে। ঝাঁকি দিয়ে ভারী কমপ্রেসড এয়ার বটল দুটো খুলে ডেকে ফেলে দিল ও। তারপর ফেসপ্লেট ঠেলে তুলে দিল কপালে।

ওর তীক্ষ্ণ, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেলাম আমি ব্রিজ থেকে। রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে তাকিয়ে আছি ওদের দিকে।

পেয়েছি! চাঁচিয়ে উঠল নিরো। ওটা সেই...।

অ্যাঁই, চুপ! ঝট করে নিরোর মুখে একটা হাত চাপা দিল ব্ল্যাঙ্ক। পরমুহূর্তে ওরা তিনজন একসাথে মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

আমাকে নিয়ে ভেবো না, ভায়েরা, নিঃশব্দে হেসে চুরুটটা খুশির সাথে নাড়লাম ওদেরকে উদ্দেশ্য করে।

আমার দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। ফিসফিস করে কথা বলছে এখন নিরো। জেসাস! একবার চিৎকার করে উঠল প্যানথার। ব্ল্যাঙ্কের পিঠে একটা চাপড় মারল সে। তারপর ওরা তিনজনই একসাথে বিস্ময় ধ্বনি ছাড়তে শুরু করল। হাসিতে উদ্ভাসিত সবার মুখ। ঠেলাঠেলি করে রেইলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। এয়ারব্যাগ আর বোঝাটা টেনে তুলছে।

ঝুঁকে পড়ে দেখছি ওদেরকে। আর তলপেটে যেন একটা গর্ত খুঁড়ছে প্রচণ্ড কৌতূহল। কি তুলে এনেছে নিরো? কি এমন সাতরাজার ধন, যা আমাকে দেখতে পর্যন্ত দিতে চাইছে না ওরা?

বোঝাটা দেখে মুহূর্তে হতাশায় ছেয়ে গেল আমার মন। আমার অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক নিরো, সবুজ ক্যানভাসটা দিয়ে সে তার গুপ্তধন মুড়ে রেখেছে আগেই। আনাড়ি হাতে নাইলনের রশি দিয়ে বাঁধা একটা বেচপ পোঁটলার মত দেখাচ্ছে বোঝাটাকে।

তবে জিনিসটা যাই হোক, খুব ভারী বটে-যেভাবে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ডেকে তা দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু। আকারে খুব বড় কিছু নয়, একটা ছোট স্যুটকেসের মত।

ডেকে নামিয়ে সেটাকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা। সবাই পাগলের মত হাসছে। মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল ব্ল্যাঙ্ক। অম্লান। হাসিতে উজ্জ্বল তার চেহারা।

এসো হে, এক নজর দেখে যাও।

আমার প্রচণ্ড কৌতূহল টের পেয়েছে সে। আমন্ত্রণ পেয়ে। সংযমের বাধটা ভেঙে গেল আমার ভিতর। অনুভব করছি। জিনিসটা কি তা আমাকে জানতেই হবে। দাঁত দিয়ে চুরুটটা কামড়ে ধরে মই বেয়ে নামতে শুরু করলাম। তারপর বো-এ দাঁড়ানো দলটার দিকে দ্রুত এগোলাম। ফোরডেকের অর্ধেকটা পেরিয়েছি, মাত্র খোলা জায়গায় ফেলেছি প্রথম পা-টা, দেখতে পাচ্ছি এখনও আমার দিকে তাকিয়ে সানন্দে হাসছে ব্ল্যাক্স, এই। সময় শান্ত, মৃদু কণ্ঠে বলল সে, হ্যাঁ, মারো!

সাত

এতক্ষণে টের পেলাম ব্যাপারটা আগে থেকে রিহার্সেল দিয়ে রেখেছে ওরা। আমার মন এবং মাথার ভিতর এমন বিদ্যুৎ গতিতে কাজ শুরু হয়ে গেল যে যা কিছু ঘটছে, মনে হচ্ছে সব যেন ধীর, অলস ভঙ্গিতে স্লো-মোশন সিনেমার মত ঘটছে।

প্যানথারের হাতে কালো চকচকে পিস্তলটা দেখতে পাচ্ছি আমি, ধীরে ধীরে উঠে আমার তলপেট বরাবর স্থির হল সেটা। বাঁ পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে ডেকে রেখেছে সে, বসে আছে সেই পায়েরই গোড়ালির উপর, অপর পা-টাও আধভাঁজ করা, সেটার হাঁটুতে পুরোপুরি লম্বা করে দেয়া পিস্তল ধরা ডান হাতের কনুই ঠেকিয়ে লক্ষ্য স্থির করছে। পিস্তলের ব্যারেল বরাবর চোখ কুঁচকে দেখছে সে, নিঃশব্দে হাসছে।

দেখলাম নিরোর সুদর্শন কচি মুখটা আতঙ্কে নীল হয়ে যাচ্ছে। প্যানথারের পিস্তল ধরা হাতটা ধরার জন্যে এগোল সে, কিন্তু এ ধরনের কিছু একটা ঘটতে পারে আশঙ্কা করে আগে থেকেই তৈরি ছিল ব্ল্যাক্স। নিঃশব্দ হাসিটা এখনও ঝুলছে তার ঠোঁটে, দুহাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল সে নিরোকে, জলকুমারীর পরবর্তী দোলটা শুরু হতে ভারসাম্য হারিয়ে চার হাত দূরে ছিটকে পড়ল নিরো।

দ্রুত এবং পরিষ্কার চিন্তা করছি এখনও। সেগুলো সাজানো গোছানো কিছু নয়, মনের পর্দা ছুঁয়ে স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে বিদ্যুৎবেগে সরে গেল কিছু অনুভব। ভাবলাম সত্যিই দারুণ নিখুঁত হয়েছে ওদের ফাঁদটা, প্রফেশনালদের কাজের গুণই এই।

অনুভব করলাম, নেকড়েদের সাথে জড়িত হয়ে যে ভুল। করেছি তার মূল্য এখন আমাকে দিতে হচ্ছে।

টের পেলাম আমাকে খুন হতে দেখার পর ওদের হাত থেকে নিরোরও এখন আর রেহাই নেই। এই কাজটাও আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে ওরা। একটু দুঃখও অনুভব করলাম। ছেলেটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল।

ভাবলাম পয়েন্ট ফরটি-ফাইভের এক্সপ্লোসিভ বুলেট তার টাগটিকে কিভাবে বিধ্বস্ত করবে। চকিতে মনে পড়ে গেল দুই হাজার ফুট পাউণ্ড হবে ধাক্কাটার ওজন।

প্যানথারের আঙুল পিস্তলের ট্রিগারটা পেঁচিয়ে ধরল। মুখে চুরুট নিয়েই আমার পাশের রেলিংয়ের দিকে লাফ দিলাম আমি। কিন্তু জানি, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

প্যানথারের প্রসারিত হাতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো পিস্তলটা, রোদের মধ্যে মাজলের মুখে ল্লান আগুনের ঝলক দেখলাম। বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর আওয়াজ এবং ভারী সীসার বুলেট একই সাথে আঘাত করল আমাকে। ঝাঁকি খেয়ে মাথাটা পিছন দিকে সরে গেল, মুখ থেকে ছিটকে উপরে উঠে যাবার সময় আগুনের ফুলকির একটা রেখা তৈরি করল চুরুটটা। বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কায় আমার ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেছে, ডেক থেকে শূন্যে উঠে গেছে পা দুটো, পাক খেতে শুরু করে শরীরটা দড়াম করে পিছন দিকের রেলিংয়ের উপর পড়ল।

ব্যথা নয়, বিশাল একটা ধাক্কা সম্পূর্ণ অসাড় করে ফেলছে আমাকে। আঘাতটা বুকে, সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ এবং জানি বুলেটটা নিশ্চয়ই আমাকে এ-ফেঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। আঘাতটা যে চরম, মৃত্যুর জন্যে যথেষ্ট, সে-ব্যাপারেও। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই আমার, এবং প্রতি মুহূর্তে আশা। করছি ঝপ করে অন্ধকার এসে গ্রাস করবে আমাকে।

শিরদাঁড়ার নিচের দিকের শেষ গিটটা প্রচণ্ডভাবে ঠুকে গেল আই লাভ ইউ, ম্যান রেলিংয়ের সাথে, দ্রুত আধপাক ডিগবাজি খেয়ে মাথা নিচে আর পা উপর দিকে উঠে গেল আমার, রেলিং টপকে সেই অবস্থায় ঝপাৎ করে পড়লাম সাগরের ঠাণ্ডা আলিঙ্গনের ভেতর।

পানি আমাকে সিধে হতে সাহায্য করল। চোখ মেলে ঝক। ঝক রূপালী বুদ্ধবুদ্ধ আর পানি ভেদ করে ঢুকে পড়া সবুজাভ রোদের আলো দেখতে পেলাম। ফুসফুস দুটো সম্পূর্ণ খালি আমার, উন্মত্তের মত পানি ঠেলে উপরে ভেসে ওঠার সহজাত একটা ঝোক চাপল-কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এখনও আমি পরিস্কারভাবে সবকিছু চিন্তা করতে পারছি। জানি, পানির উপর মাথা তোলা মাত্র খুলিটা উড়িয়ে দেবে মাইক প্যানথার। এক গড়ান দিয়ে নিচের দিকে ডাইভ দিলাম, এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ে ঢুকে গেলাম বোটের নিচে।

দূরত্ব সামান্য কিন্তু ফুসফুস খালি থাকায় মনে হচ্ছে জলকুমারীর মসৃণ সাদা তলপেট ঘন্টার পর ঘন্টা ধীর গতিতে আমার উপর দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে ডুব সাঁতার দিচ্ছি, ভাবছি এখনও পায়ে জোর পাচ্ছি কিভাবে!

আচমকা অন্ধকার ঘেরাও করল আমাকে। কোমল কিন্তু ঘন লাল একটা মেঘের মাঝখানে নিজেকে আবিষ্কার করে আতঙ্কে কঁকড়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ করে বুঝলাম এটা আমার নিজেরই রক্ত, ক্ষতগুলো থেকে হু হু করে বেরিয়ে এসে লাল করে দিয়েছে পানিকে। গায়ে জেব্রার নকশা নিয়ে খুদে মাছগুলো তীরবেগে ছুটোছুটি করছে লাল মেঘের ভেতর, লোভীর মত হাঁ করে গোত্রাসে গিলছে সেগুলো। আমার রক্ত ওদের পাগল করে দিয়েছে।

আরেকবার চেষ্টা করেও বাঁ হাতটাকে নাড়াতে পারলাম না। আমার পাশে লম্বা হয়ে রয়েছে সেটা, কোন সাড়া নেই। দুই পা এবং একটা হাতের সাহায্যে জলকুমারীর কীলের নিচ দিয়ে এগোলাম, তারপর শেষপ্রান্তের জলরেখার দিকে উঠতে শুরু করলাম।

ওঠার সময় বোটের স্টার্ন থেকে নেমে আসা নাইলনের রশিটা দেখতে পেলাম পানিতে। হেঁা মেরে ধরলাম রশির প্রান্তটা, তারপর ভেসে উঠলাম জলকুমারীর স্টার্নের নিচের পানিতে। বাতাস টানার সময় অনুভব করলাম আহত এবং অসাড় লাগছে ফুসফুস দুটো। পুরানো তামার মত লাগল মুখের ভিতর বতাসের স্বাদ, বমি পেল, কিন্তু একটানে যতটা সম্ভব গিলে নিলাম।

এখনও পরিষ্কার ভাবতে পারছি সব। আমি রয়েছি স্টার্নের নিচে, নেকড়ে জোড়া রয়েছে বো-তে, কারবাইনটা রয়েছে মেইন কেবিনে, ইঞ্জিন হ্যাচের ভিতর।

যতটা পারলাম নিজেকে উঁচু করে ডান কজিতে জড়িয়ে। নিলাম রশিটা, বুকের কাছে হাঁটু তুলে বোটের গায়ে সরু কাঠের। ঘরের উপর গোড়ালি রেখে উঠে দাঁড়ালাম।

জানি, মাত্র একবার চেষ্টা করার মত শক্তি রয়েছে আমার, তার বেশি নয়। সুতরাং চেষ্টায় কোন খুঁত থাকলে চলবে না। উপরের বো থেকে ভেসে আসা ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিরাগারাগি, চৈচামেচি চলছে নিজেদের মধ্যে। এসব থেকে মন সরিয়ে আমার সব শক্তি একত্রিত করলাম, তারপর দুটো পা আর একটা হাতের সাহায্যে লাফ দিলাম উপরের দিকে। ঝাঁকিটা লাগায় দৃষ্টিপথে সর্ষে ফুল ফুটে

উঠল, অসাড় বুক ধাক্কা খেলাম প্রচণ্ডভাবে। পানি থেকে উঠে এসেছি আমি, স্টার্ন রেলিংয়ের ওপর পড়ে অর্ধেক সাগরের দিকে, অর্ধেক বোটের দিকে ঝুলছি। কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে খালি চটের বস্তার মত, যেন এইমাত্র রোদে শুকোতে দিয়েছে কেউ।

কয়েক সেকেন্ড ওভাবে পড়ে থাকলাম। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার। হয়ে এল। পিচ্ছিল, গরম রক্ত সড়সড় করে কাঁধ, গলা, মাথার। পিছনের চুল বেয়ে নামছে-দেখতে পাচ্ছি, ককপিটের মেঝেতে রক্তের পুকুর তৈরি হচ্ছে কয়েকটা। বুঝলাম, মারা যেতে আর বেশি দেরি নেই আমার।

উন্মত্তের মত ছুঁড়লাম পা দুটো। রেলিং থেকে খসে পড়লাম বোটের দিকে। ককপিটের মেঝেতে সোজা নামল মাথাটা, দড়াম করে আছড়ে পড়ল শরীরটা, ফাইটিং চেয়ারে বাড়ি খেল পায়ের গোড়ালি। ব্যথায় কঁচকে উঠল মুখ, দাঁতে দাঁত চেপে আছি, ঠোঁটের প্রান্ত দুটো দুই কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। পাশ ফিরে শুয়ে আছি, শরীরের উপর ক্রমশ নিচের দিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছি। হড় হড় করে বেরিয়ে আসছে রক্ত, তাতে ভাসছি আমি। সাপের মত বুকে হেঁটে এগোতে শুরু করলাম কেবিনের দিকে, পিছনে রেখে যাচ্ছি রক্তের মোটা ধারা। প্রবেশপথের পাশে কব্ধিংয়ের কাছে পৌঁছে আরেকটা অমানুষিক চেষ্টায় উঠে দাঁড়ালাম কোনমতে, পায়ের উপর ভর দিয়ে এক হাতের উপর ঝুলে আছি, কিন্তু বুঝতে পারছি পা দুটো অনুভূতি হারিয়ে ফেলছে, রাবারের মত লাগছে এখনই।

দ্রুত কেবিনের কোণে উঁকি দিয়ে তাকালাম, ফোরডেকের উপর দিয়ে সোজা বো-এ গিয়ে পড়ল আমার দৃষ্টি, যেখানে ওরা তিনজন এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে একসাথে।

পিঠে আবার কমপ্রেশন্ড এয়ার বটলগুলো স্ট্রাপ দিয়ে দ্রুত বাঁধার চেষ্টা করছে নিরো। আতঙ্কে এখনও বিস্ফারিত হয়ে আছে তার দুই চোখ। ব্ল্যাক্সের উদ্দেশ্যে রাগে চোঁচাচ্ছে সে।

আপনি পাষণ্ড! আপনি পিশাচ! আপনি খুনী...অবশ্যই ওকে আমি খুঁজতে যাচ্ছি, ওর লাশ আমি-ক্রাইস্ট, হেলপ মি, আপনাদের যাতে ফাঁসি হয়...।

দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছি আমি, এই অবস্থাতেও ছেলেটার সৎ সাহস লক্ষ্য করে খুশি লাগল মনটা। তালিকায় সে-ও আছে তা বোধহয় একবারও ভাবছে না ও।

খুন, ঠাণ্ডা মাথায় খুন, পাগলের মত চাঁচাচ্ছে নিরো। রেইলের দিকে ফিরল ও, নাক আর চোখে ঠিকমত বসিয়ে নিচ্ছে।

পাশে দাঁড়ানো প্যানথারের দিকে তাকাল ব্ল্যাক্স। ওদের দিকে। পিছন ফিরে রয়েছে নিরো। ছোট্ট করে একটু ঝাঁকাল ব্ল্যাক্স মাথাটা।

সাবধান করার জন্যে চাঁচিয়ে উঠলাম আমি, কিন্তু আওয়াজটা মুখের ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ করে থেমে গেল। লম্বা দুই পদক্ষেপে নিরোর ঠিক পিছনে চলে গেল প্যানথার। এবার কোন ভুল করল না সে। মস্ত পয়েন্ট ফরটি ফাইভের মাজল নিরোর মাথার খুলির গোড়ায় ঠেকাল, ডাইভিং সুটের রাবার ভূডে গর্ত করে ঢুকে গেল এক্সপ্লোসিভ বুলেট।

চৌচির হয়ে গেল নিরোর খুলি। ডাইভিং মাস্কের গ্লাস প্লেট ভেঙে গুড়ো কাঁচের সাথে গুড়ো খুলি একটুকরো মেঘের মত। বেরিয়ে এল। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে শরীরটা ছিটকে পড়ল বোট। থেকে, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সাথে ওয়েট বেল্ট আছে, নাকের ডগাটা কড়ে আঙুল দিয়ে চুলকাচ্ছে ব্ল্যাক্স, শান্তভাবে বলল সে, ডুবতে কোন অসুবিধে হবে না ওর। কিন্তু রানাকে খুঁজে বের করা দরকার। বুকে বুলেটের গর্ত নিয়ে লাশটা ভেসে উঠলে বিপদ হতে পারে।

বানচোত লাফ দিয়ে সরে গেল, আমার ওপর রাগে বিকৃত শোনাৎ ওর কণ্ঠস্বর। আর একটু হলে বেঁচে যেত শালা...।

কানে আর কিছু ঢুকল না আমার। পা দুটো টলে উঠল, ডেকের উপর পড়ে গেলাম আমি। আতঙ্কে সাংঘাতিক অসুস্থ বোধ করছি। বয়স আমার অল্প হলেও অনেক রকম মৃত্যু দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে এরইমধ্যে, কিন্তু নিরোর মৃত্যু ভয়ঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টি করল আমার মনে। আমার নিজের মৃত্যুর আগে মাত্র একটা ইচ্ছা পূরণ করতে চাইলাম আমি। যেমন করে হোক।

ক্রল করে এগোতে শুরু করলাম ইঞ্জিনরুম হ্যাচের দিকে। সাদা ডেকটা আমার সামনে পড়ে রয়েছে দুস্তর সাহারা মরুর মত। লোহার মত শক্ত একটা হাতের প্রচণ্ড চাপ অনুভব করতে শুরু করেছি

কাঁধে, পিছন দিকে টেনে রাখছে আমাকে। মাথার ওপরের ডেকে ওদের পায়ের আওয়াজ শুনেই হ্যাঁৎ করে উঠল বুক। মনের ভিতর শেষ ইচ্ছা পূরণের আশাটা দপ করে নিভে গেল। ককপিটে ফিরে আসছে ওরা।

দশ সেকেন্ড, খোদা, দশটা সেকেন্ড! ফিসফিস করে উঠলাম আমি। দশটা সেকেন্ড...আমার জীবনের শেষ চাওয়া। কিন্তু মনে মনে জানি, সবই বৃথা। হ্যাচের কাছে আমি পৌঁছুবার আগেই কেবিনে ঢুকে পড়বে ওরা। কিন্তু বৃথা জেনেও মরিয়া হয়ে এগোচ্ছি।

হঠাৎ পায়ের শব্দ থেমে গেল, কিন্তু গলার আওয়াজ এখনও শুনতে পাচ্ছি। কথা বলার জন্যে ডেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা। ইঞ্জিন হ্যাচের কাছে পৌঁছে স্বস্তি এবং আশার পরশ অনুভব করলাম আমি।

কিন্তু হ্যাচের ঢাকনিটা খোলা যাচ্ছে না শত চেষ্টাতেও। কিভাবে যেন শক্তভাবে আটকে গেছে, একচুল নড়াতে পারছি না। অসম্ভব দুর্বলতা বোধ করছি, সেজন্যে রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। আঙুলের ডগা আর নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছি ঢাকনির কিনারা আর গাল দিচ্ছি নিজেকে, মর শালা... হঠাৎ স্প্রিংয়ের মত লাফ দিয়ে খুলে গেল ঢাকনিটা, আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ল ডেকে, বিকট শব্দ হল কেবিনের ভিতর।

সাথে সাথেই চুপ করে গেল ওরা। শুনছে।

ক্রল করে আরও কইঞ্চি এগোলাম। উপুড় হয়ে শুয়ে আছি, ডেকের নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছি বগল পর্যন্ত ডানহাতটা, আঙুলগুলো কারবাইনের স্টকে গিয়ে ঠেকল।

কুইক, এদিকে! উচ্চকিত বিস্ময় ধ্বনি শুনতে পেলাম, ওটা ব্ল্যাক্সের কণ্ঠস্বর। পরমুহূর্তে ডেকের উপর ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেলাম। দ্রুত এগিয়ে আসছে ককপিটের দিকে।

কারবাইন ধরে টানছি, কিন্তু উঠে আসছে না সেটা, সম্ভবত সিলিংয়ের সাথে বেকায়দাভাবে আটকে গেছে।

ক্রাইস্ট! রক্তে ভেসে যাচ্ছে ডেক! চেষ্টা করে উঠল ব্ল্যাক্স।

নিশ্চয়ই রানা! দ্রুত বলল প্যানথার, স্টার্নের দিক থেকে উঠে এসেছে...

ঠিক তখনই মুক্ত হল কারবাইনটা, এবং আমার হাত থেকে খসে নিচের ইঞ্জিনরুমে পড়ে যেতে চাইল সেটা। প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, পরক্ষণে আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেল নিজে থেকেই, রয়ে গেল স্টকটা মুঠোর ভিতর। গড়িয়ে সরে এলাম আমি। মনে হল প্রায় এক যুগ চেষ্টা করে উঠে বসতে পেরেছি। কোলের ওপর পড়ে রয়েছে কারবাইনটা। হ্যাচ থেকে ওটা তোলার সময় বুকে একটা ঘষা খাওয়ায় টিসু ছিড়ে গেছে, প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি। সেই থেকে। কিন্তু সেটাকে আমি গ্রাহ্য করছি না। বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে আরেক দিকে সরিয়ে দিলাম সেফটিক্যাচ। চোখে ঘাম। আর লবণাক্ত পানির ফোটা পড়ছে, কেবিনের দরজার দিকে তাকাতেই ঝাঁপসা দেখছি সামনেটা। ছুটে কেবিনে ঢুকল ব্ল্যাক্স। আমাকে দেখতে পাবার আগে তিন পা এগিয়ে এল সে। তারপর দাঁড়াল, হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হাঁপাচ্ছে সে, ঘোমে গেছে লাল মুখটা। আমাকে কারবাইন তুলতে দেখে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত দুটা সামনে তুলে মুখ ঢাকতে চেষ্টা। করছে, আঙুলের ফাঁকে আতঙ্কে বিস্ফারিত একটা চোখ দেখতে পাচ্ছি। কড়ে আঙুলের ডায়মণ্ডটা ঝিক করে উঠল একবার।

নিঃশব্দে ক্ষীণ একটু হাসলাম আমি। এবং কল্পনায় বুঝলাম, হাসিটাকে ভৌতিক বলে মনে হল ব্ল্যাক্সের। একহাতে ধরা কারবাইনটার ওজন ঘাবড়ে দিল আমাকে। ব্ল্যাক্সের হাঁটুর কাছে নল তুলে আর দেরি করলাম না, চাপ দিলাম ট্রিগারে।

একটানা গর্জনের সাথে কারবাইন থেকে একটা অবিচ্ছিন্ন রেখার মত বেরিয়ে গেল বুলেটগুলো, পিছু ধাক্কার ফলে ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ব্যারেলটা উপর দিকে। ব্ল্যাক্সের তলপেট থেকে গলা পর্যন্ত দুফাঁক হয়ে গেল, ধাক্কা খেয়ে কেবিনের দেয়ালে পিঠ সঁটে দাঁড়িয়ে আছে এখনও সে, কিন্তু প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেছে আগেই।

জানি, কারবাইনটা খালি করা উচিত নয়, প্যানথারের সাথে বোঝাপড়া বাকি রয়েছে এখনও, কিন্তু তবু আমি ট্রিগার থেকে সরতে পারছি না আঙুল, ব্ল্যাক্সের গলা, থুতনি, দাঁত, নাক, কপাল এবং মাথায় অসংখ্য ফুটো তৈরি করে যাচ্ছে বুলেটগুলো।

তারপর কিভাবে যেন নিস্তেজ হয়ে গেল আঙুলটা, থেমে গেল বুলেট বৃষ্টি। দেয়াল থেকে রক্তের সাথে গড়িয়ে ধীরে ধীরে কেবিনের মেঝেতে পড়ছে বিধ্বস্ত, ছিন্নভিন্ন লাশটা। পোড়া করডাইট আর মিষ্টি রক্তের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে কেবিনের বাতাস।

কেবিনের কম্প্যানিয়নওয়েতে মাথা নিচু করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে প্যানথার, কেবিনের মাঝখানে আমাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুঁড়ল।

ধীরেসুস্থে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করার প্রচুর সময় রয়েছে ওর হাতে, কিন্তু আতঙ্কে ঘাবড়ে গেছে সে। বিস্ফোরণের শব্দ কানের পর্দায় বাড়ি মারল, আর বুলেটটা আমার কাঁধের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। ঝাঁকি খেয়ে পিস্তলের নল উঠে গেছে উপর দিকে, আবার গুলি করার জন্যে প্যানথার সেটাকে নামাতে যাচ্ছে দেখে কারবাইনটা একটু উঁচু করে ধরেই ড্রিগারে আবার চাপ দিলাম আমি।

বীচে একটাই মাত্র গুলি ছিল, তবে একটাতেই কাজ হল। লক্ষ্য স্থির করিনি আমি, ব্যারেল ওর দিকে সোজা করেই ড্রিগারে চাপ দিয়েছি। কনুইয়ের উল্টোদিকে গিয়ে লাগল বুলেটটা, চুরমার করে দিল হাড়ের জয়েন্টটা। পিস্তলটা ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল ডেকে, সেখান থেকে কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে স্টার্নের অগভীর ড্রেনের কিনারায় গিয়ে থামল সেটা।

ধাক্কা খেয়ে একদিকে একটু ঘুরে গেল প্যানথার, ডান হাতের উপরের অংশটা অদ্ভুতভাবে মোচড় খাচ্ছে, কিন্তু ভাঙা জয়েন্টের কাছ থেকে নিচের অংশটা তার শরীরের পাশে মরা সাপের মত। ঝুলছে। ঠিক এই সময় কারবাইনের ফ্যারিঙ পিন বাড়ি মারল খালি চেম্বারে।

একই সাথে মুখ তুললাম আমরা, পরস্পরের দিকে তাকালাম। দুজনেই আহত। কিন্তু পুরানো আক্রোশটা পুরোপুরি রয়েছে আমাদের মধ্যে, একজন আরেকজনকে নির্দিষ্টায়া খুন করতে চাই। নিরোর খুলিতে পিস্তল ঠেকাচ্ছে ও...চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যটা, এবং কোথা থেকে শক্তি পেলাম জানি না, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করলাম ওর দিকে। ঠকাস করে হাত থেকে পড়ে গেল খালি কারবাইনটা।

ভাঙা হাতটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল প্যানথার। ছুটল ড্রেনে পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে।

ওকে বাধা দেবার কোন উপায় দেখছি না। ওর আঘাতটা মারাত্মক কিছু নয়, অন্তত ওটা ওকে এখুনি অচল করে দেবে না, এবং সম্ভবত বাঁ হাত দিয়েও অব্যর্থ ভাবে গুলি ছুঁড়তে পারে ও।

ককপিটে বেরিয়ে এসেছি আমি। এখনও এগোচ্ছি প্যানথারের দিকে। ঝুঁকে পড়ে তুলে নিচ্ছে ও পিস্তলটা। হঠাৎ ভিন্নখাতের একটা তুমুল স্রোতের মুখে পড়ে গেল জলকুমারী, বেমক্লা ধাক্কা খেয়ে বুনো ঘোড়ার মত পিছু হটল সে। তাল হারিয়ে ফেলল প্যানথার, পিস্তলটা পিছলে চলে যাচ্ছে ডেকের উপর দিয়ে তার নাগালের বাইরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সেটাকে অনুসরণ করল ও, কিন্তু আমার রক্তে পা পিছলে দড়াম করে আছাড় খেল একটা। ওর দুর্ভাগ্য, শরীরের নিচে চাপা পড়েছে ভাঙা হাতটা। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল, কিন্তু থামল না, গড়িয়ে উপুড় হয়েই দ্রুত ক্রল করে এগোচ্ছে চকচকে কালো পিস্তলটার দিকে।

ককপিটের বাইরের বাল্কহেডের দিকে তাকিয়ে আছি। র্যাকটা আমার নাগালের মধ্যেই। দশ ফুট লম্বা, মাথায় স্টেনলেস স্টীলের ভয়ঙ্কর হুকসহ লম্বা ফ্লাইং গ্যাফ (কোচ)গুলো দেখছি। হকের পাতগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে ঘাসে ক্ষুরের মত ধারালো করে রেখেছে রডরিক। বড় মাছের শরীরে গভীরভাবে বেঁধাবার জন্যে তৈরি এগুলো, লক্ষ্য স্থির করে জতুসইভাবে আঘাত করতে পারলে ধড় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মাছের মাথা, তারপর হকের সাথে ভারী নাইলনের রশি বেঁধে টেনে বোটে তোলা হয় মাছটাকে।

ধাক্কা দিয়ে র্যাকের ক্ল্যাম্প খুলে ফেললাম। একটা কোচ নামিয়ে তাকালাম প্যানথারের দিকে।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে উঠে বসেছে প্যানথার। রক্ত ভেজা হাত থেকে পিছলে পড়ে গেল সেটা আবার। আমার দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে, তাই কিছুই বুঝতে পারছে না ও। খপ করে পিস্তলটা ধরল আবার। উল্টোভাবে তুলে নিল। তারপর দ্রুত তালে হাত নেড়ে সেটাকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে তালুর উপর। অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই, সাংঘাতিক ব্যস্ত সে। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসেছি আমি, এক হাত দিয়ে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে কাঁধের উপর তুলেছি কেঁচটা, লক্ষ্য স্থির করছি প্যানথারের ধনুকের মত বাঁকা পিঠের মাঝখানে। থ্যাচ করে পিঠে গাঁথলাম হুকটা, পাজরের ফাঁক গলে গভীর ভাবে ঢুকে গেল ভিতরে ধারালো পাতগুলো। মুখ খুবড়ে ডেকের ওপর পড়ে গেছে

প্যানথার, আবার ছুটে গেছে পিস্তলটা হাত থেকে। বোটের দোলায় গড়িয়ে চলে গেল সেটা আরেক দিকে।

চিৎকার করছে প্যানথার। শরীরের ভিতর ধারালো ইস্পাত নিয়ে ছটফট করছে সে তীব্র যন্ত্রণায়। আরও জোরে ঠেলে দিচ্ছি। আমি কোচটা, চকচকে ইস্পাতটা যেখানে চওড়া হয়ে বেঁকে গেছে সেই বাক পর্যন্ত ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ওর হার্ট বা ফুসফুস ফাঁক করতে চাইছি আমি। কিন্তু হঠাৎ হকের গোড়াটা মট করে ভেঙে গেল। ডেকের উপর দিয়ে গড়িয়ে পিস্তলটার দিকে এগোচ্ছে। আবার প্যানথার। কেঁচটা ছেড়ে দিয়ে আমিও হাতড়াতে শুরু করলাম, তারপর হাতে ঠেকতেই তুলে নিলাম দড়িটা।

এরপর আমি আর প্যানথার নিজেদের রক্তে গোটা ডেক জুড়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করলাম। স্রোতের মুখে পড়ে জলকুমারী। দুলতে শুরু করলেই হড়কে একদিক থেকে আরেক দিকে চলে যাচ্ছি, দোল থামলে গড়ান দিয়ে ধরতে চাইছি প্যানথারকে। পিস্তলটার যেন নিজস্ব একটা ইচ্ছে গজিয়েছে, যতবার ছুঁতে যাচ্ছে তাকে প্যানথার, ততবার একেবারে শেষ মুহূর্তে ফাঁকি দিয়ে সরে যাচ্ছে সে ওর নাগালের বাইরে। আর আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে আমার হাতের দড়ি আর প্যানথারের গলা। ফাঁস পরাতে প্রতিবার ব্যর্থ হচ্ছি আমি।

সন্তুষ্টির কারণ এটুকুই যে অবশেষে দুর্বল হয়ে পড়ছে প্যানথার। এখন আর সে এমন কি পিস্তলটা ধরারও কোন চেষ্টা। করছে না। শরীরে গাঁথা প্রকাণ্ড হুকটার বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশটা বাঁ হাত দিয়ে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে আছে সে, কি উদ্দেশ্যে একমাত্র ও-ই জানে। টেনে ওটাকে বের করার সাধ্য। দশজন আহত প্যানথারেরও নেই।

জলকুমারী আবার আমাকে সাহায্য করল। একদিকে কাত। হয়ে গিয়ে প্যানথারকে একেবারে আমার সামনে পৌঁছে দিল সে। হাত বাড়িয়ে ফুলের মালার মত পরিয়ে দিলাম ওর গলায় ফাঁসটা, তারপর ফাইটিং চেয়ারের শক্ত পায়ার সাথে দড়িটা আটকে সবটুকু শক্তি দিয়ে টানতে শুরু করলাম।

টানছি, কিন্তু দড়িতে জোর পড়ছে না। জোর ফুরিয়ে গেছে। প্যানথারেরও। ফাঁস থেকে গলাটাকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা না করে হুকটা তেমনি খামচে ধরে আছে এখনও সে; যেন সাতরাজার অমূল্য

ধন ওটা, আর আমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে। তাকিয়ে আছে। তারপর হঠাৎ ফোস করে ভয়ঙ্কর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মুখের ভিতর থেকে জিভটা বাইরে বের করে দিল ও, ঢিল পড়ল পেশীতে, বোটের দোলার সাথে তার মাথাটা সামনে পিছনে অদ্ভুত এক ছন্দে দুলতে শুরু করল।

আমার অজান্তে হাতের মুঠোটা আলগা হয়ে গেল, খসে পড়ল দড়িটা। চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম ডেকের উপর। বিশাল একটা অন্ধকার ঘিরে ফেলল আমাকে।

.

জ্ঞান ফেরার পর মনে হল, অ্যাসিড দিয়ে কে যেন পুড়িয়ে দিয়েছে আমার মুখ। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে গেছে, আর প্রচণ্ড পিপাসায় গলার ভিতর যেন আগুন ধরে গেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সূর্যের দিকে মুখ করে একটানা ছয় ঘন্টা শুয়ে থাকলে এর চেয়ে কম আর কি হতে পারে।

পাশ ফিরতে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম বুকের তীব্র ব্যথায়। শুধু মুখটা হাঁ হল, কোন আওয়াজ বেরুল না। ব্যথাটাকে কমাতে দেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে থাকলাম, তারপর আঘাতটার অবস্থা বোঝার জন্যে হাত দিয়ে হাতড়াতে শুরু করলাম আহত জায়গাগুলো। আমার বাঁ হাতের বাইসেপ ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকেছে বুলেট, হাড়টাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে ট্রাইসেপে বিরাট একটা গর্ত করে-বেরিয়েই ঢুকেছে আমার বুকের পাশে।

আঙুল দিয়ে আঘাতগুলো অনুভব করার সময় ব্যথায় আর ক্লান্তিতে ফোপাচ্ছি আমি। একটা পাঁজরের হাড়ের উপর দিয়ে পিছলে এগিয়েছে বুলেটটা, চামড়া আর মাংস হারিয়ে নিরাবরণ হয়ে গেছে হাড়টা, দুপাশের থেঁতলানো মাংসে হাড় আর সীসার গুঁড়ো রয়ে গেছে, আঙুলে কড়কড়ে লাগছে সেগুলো। পিঠের মোটা পেশীতে ঢুকে গেছে এরপর বুলেটটা, কিন্তু শোল্ডার ব্লেডের নিচে কোন গর্ত নেই অনুভব করে বুঝলাম বেরোননি তিনি, রয়ে গেছেন ভিতরেই।

ডেকে পিঠ দিয়ে শুয়ে মুখ খুলে হাঁপাচ্ছি, চোক গিলে বমির ভাবটাকে দমন করার চেষ্টা করছি বারবার। খোঁচাখুঁচি করায় তাজা রক্ত বেরুচ্ছে আবার ক্ষতগুলো থেকে। বুকের খাঁচার ভিতর বুলেটটা চোকেনি, এটুকু অন্তত পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি-যত ক্ষীণ আর নগণ্যই হোক, এখনও একটু আশা আছে আমার। কিন্তু দুর্বলতা আর অসহায় ভাব আমাকে এখনও স্থবির করে রেখেছে।

বিশ্বামের ফাঁকে পরিবেশটা দেখে নিচ্ছি আধবোজা চোখে। আমার কাপড়-চোপড় আর চুল শক্ত হয়ে গেছে শুকনো রক্তে। ককপিটের মেঝেটা রক্তে লেপা, শুকনো কালচে রক্ত চকচক করছে রোদে। জলকুমারীর দোল খেয়ে আমার দিকে মুখ ঘুরে গেছে প্যানথারের। পিঠে ইস্পাতের ভুক আর গলায় দড়ির ফাঁস নিয়ে এখনও বসে আছে সে, অক্লান্তভাবে আগুপিছু দুলছে তার মাথাটা। ফাইটিং চেয়ারের সাথে বাঁধা দড়ির ফাঁসটাই তাকে এখনও টেনে বসিয়ে রেখেছে। পেটের নাড়িভুঁড়ি এরই মধ্যে ফুলেফেঁপে গেছে তার, ভরা মাসের পোয়াতি মেয়েলোকের মত চাউস দেখাচ্ছে পেটটা।

ক্রল করে এগোতে শুরু করলাম। বোটের দোলায় কেবিনের দরজার সামনে সরে এসেছে ব্ল্যাক্লেবর লাশ। তার উপর দিয়ে ক্রল করে ভিতরে ঢুকলাম। বার-এর পিছনে আইস-বক্সটা চোখে। পড়তেই আবার ফুপিয়ে উঠলাম আমি। তিন ক্যান কোকাকোলা খেলাম, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বিষম খাচ্ছি বারবার, নাক মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসছে ঝঝাল পানীয়, প্রতি চোকের পর হাঁপাচ্ছি-ঠাণ্ডা পানিতে ভেসে যাচ্ছে বুক। তারপর আবার শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজে ঘুমুতে চাইছি চির জীবনের মত।

কোথায় রয়েছি আমরা? প্রশ্নটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে মুহূর্তে সচেতন করে তুলল আমাকে। বহু কষ্টে দুপায়ের উপর ভর দিয়ে। দাঁড়ালাম, বেরিয়ে এলাম জমাট রক্তে মোড়া ককপিটে।

বোটের নিচে মোজাম্বিক স্রোতের গভীর পারপল ব্লু পানি বয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার একটা দিগন্তরেখা ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে জলকুমারীকে। কয়েক জায়গায় পুরু মেঘের স্তর দেখা যাচ্ছে, উঠে আসছে গাঢ় নীল আকাশের বিশাল গম্বুজের দিকে। ভাটা আর বাতাসের টানে পূবদিকে বহুদূর চলে এসেছে জলকুমারী। তবে চারধারে নড়াচড়ার যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম এবং তারপর ঘুম জড়িয়ে এল আমার চোখ। আবার যখন ঘুম ভাঙল, মাথাটা পরিষ্কার এবং হালকা লাগল, কিন্তু অনুভব করলাম সাংঘাতিক শক্ত হয়ে গেছে স্ফতগুলো। একটু নড়লেই প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাইছে তীব্র ব্যথায়। একটা হাতের কনুই আর হাঁটু দুটোর উপর ভর দিয়ে শরীরটাকে ঘষে ঘষে শাওয়ার রুমে পৌঁছলাম। ওষুধের বাক্সটা ব্যাক থেকে নামানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ঝাঁটা দিয়ে গুঁতো মেরে নিচে ফেলতে চেষ্টা করলাম। বেশ ভারী জিনিস। সহজে

নাড়ানো যাচ্ছে না। যখন পড়ল, মাথাটা সরিয়ে নিতে দেরি হয়ে যাওয়ায় আমার মাথার ওপরই পড়ল।

শার্ট ছিড়ে ক্ষতগুলো লেপে দিলাম অ্যান্টিসেপটিক লোশন দিয়ে। তারপর কোনরকমে সার্জিক্যাল ড্রেসিং এঁজে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধলাম। কিন্তু এটুকু পরিশ্রমেই আবার জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম আবার। আহত হাতটা একটা স্লিঙে বাঁধার সময় ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠলাম শিশুর মত। আরও কঠিন কাজ অপেক্ষা করছে সামনে। ব্রিজের দিকে রওনা হতেই একসাথে হামলা চালাল বমি ভাব, আচ্ছন্নতা আর তীব্র যন্ত্রণা।

একবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল জলকুমারীর ইঞ্জিন। নিয়ে চলো আমাকে ভারলিং, বিড়বিড় করে বলে অটোমেটিক পাইলটের হাতে ছেড়ে দিলাম ওকে। অনুমানের ওপর নির্ভর করে একটা কোর্স স্থির করে দিয়েছি। ডেকের ওপর বসতে যাব, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম এবং জ্ঞান হারালাম আবার।

জ্ঞান ফিরল সন্দের ঠিক আগে। জলকুমারীকে অস্বাভাবিক শান্ত দেখে হাত করে উঠল বুক। মৌজাস্থিক স্রোতের মধ্যে থাকলে যে দোলা আর গতি হবার কথা, তা নেই। উঠে দাঁড়িয়ে ভুইলটা ধরলাম। সাগরের একটা ঘেরা অংশে কখন যেন ঢুকে পড়েছে বোট। সামনে তাকিয়ে শেষ প্রহরের ম্লান আলোয় উঁচু মাটির তীর দেখতে পেলাম। আর একটু দেরি হলে সর্বনাশ ঠেকানো যেত না। থ্রটল বন্ধ করে দিয়ে নিউট্রাল করলাম ইঞ্জিন। তীরের কাঠামোটা হঠাৎ চিনতে পারলাম আমি। বিগ গাল আইল্যান্ড ওটা। কোর্স নির্ধারণে একটু ভুল হয়েছিল আমার, এ্যাণ্ড। হারবারের চ্যানেলকে পাশ কাটিয়ে সেন্ট মেরীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তের খুদে প্রবাল দ্বীপগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছে জলকুমারী।

ভুইলের ওপর শরীরের ভর চাপিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছি, এই সময় ফোরডেকে চোখ পড়ল আমার। সবুজ। ক্যানভাসে ঢাকা পোটলাটা এখনও পড়ে রয়েছে ওখানে। একটা। শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীরে। কি আছে ওটার মধ্যে? হঠাৎ মনে হল, যাই থাকুক, বোট থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে ওটাকে। কেন কথাটা মনে হল তা ঠিক জানি না, কিন্তু উপলব্ধি করছি ওই ক্যানভাসের ভেতর মহাবিপদের বীজ সুপ্ত হয়ে আছে। ওটা নিয়ে রোদ ঝলমলে দিনের বেলা গ্র্যাণ্ড হারবারে ফেরা চলবে না। পানি। থেকে তুলতে না তুলতে ওটার জন্যে এরই মধ্যে খুন হয়ে গেছে তিনজন লোক-এবং একটা বুলেট এখনও ঢুকে রয়েছে আমার। বুক।

ফোরডেকে পৌঁছতে পনেরো মিনিট লাগল আমার। এইটুকু দূরত্ব পেরোতে দুবার অচেতন হয়ে পড়লাম। ক্রল করে সবুজ। ক্যানভাসটার কাছে যখন পৌঁছলাম তখন প্রতিটি নড়াচড়ার সাথে সশব্দে ফোঁপাচ্ছি।

পরবর্তী আধঘন্টা শক্ত ক্যানভাস আর নাইলনের রশি ধরে। বৃথাই টানাইঁাচড়া করলাম। একটা মাত্র হাতের দুর্বল, অসাড় আঙুল দিয়ে পোঁটলাটা খোলা সম্ভব নয়। ভিতরে কি আছে দেখার আশা আপাতত ছেড়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিলাম। তারপর সূর্যের শেষ রশ্মির সাহায্যে দ্বীপটার শেষ মাথার একঝাড় পাম আর উঁচু কয়েকটা চিবিকে সরলরেখার মধ্যে রেখে একটা বিয়ারিং নিলাম- জায়গাটাকে অত্যন্ত সাবধানে চিনে রাখলাম।

দশ মিনিট চেষ্টা করে ফোরডেক রেলিংয়ের একটা অংশ খুলে ফেললাম। সূর্য ডুবে গেছে ইতিমধ্যে, তবে এখনও অন্ধকার নামেনি। দুই পা দিয়ে ঠেলা মেরে পোঁটলাটাকে একটু একটু করে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কিনারার দিকে। এক সময় কিনারা থেকে পড়ে গেল সেটা, ঝপাৎ করে শব্দ হল, ছিটকে এসে চোখেমুখে লাগল সাগরের পানি।

নড়াচড়ায় ক্ষতের সবগুলোর মুখ খুলে গেছে আবার। ড্রেসিং চুইয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। ডেকের ওপর দিয়ে ফিরে আসছি, কিন্তু সবটা পেরোনো সম্ভব হল না, ককপিটের কাছাকাছি পৌঁছে শেষবারের মত জ্ঞান হারালাম।

ভোরের উষ্ণ রোদ আর সী-গালের তীক্ষ্ণ চিংকারে জেগে উঠলাম আমি। কিন্তু চোখ মেলে তাকাতে ঝাঁপসা লাগল সূর্যটাকে, একটা কালো ছায়া যেন ঢেকে রেখেছে সেটাকে। আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল শরীরে। বুঝতে পারছি, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছি আমি। উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম শক্তি নেই, একচুল নড়তে পারছি না। দুর্বলতা আর যন্ত্রণার কয়েক হাজার টন ওজন চেপে রয়েছে আমার শরীরে। অদ্ভুতভাবে একদিকে কাত হয়ে আছে জলকুমারী, সম্ভবত উঁচু এবং শুকনো কোন সৈকতে উঠে বসে আছে সে।

মাস্তুল আর পাল টাঙাবার দড়িডড়ার দিকে তাকিয়ে আছি নিশ্চলক চোখে। কালো পিঠওয়ালা তিনটে সী-গাল একটা লোহার রডে পাশাপাশি বসে আছে। নিচে আমাকে ভাল করে এবং

একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্যে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে ঘন-ঘন এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাচ্ছে ওরা। পরিষ্কার হলুদ রঙের ঠোঁটগুলো ইস্পাতের মত শক্ত আর মজবুত দেখাচ্ছে। ঠোঁটের ওপরের অংশটা বেঁকে গিয়ে ছুঁচাল হয়ে শেষ হয়েছে, সেটুকুর রঙ লাল। চকচকে কালো চোখ মেলে দেখছে ওরা আমাকে, অসহিষ্ণুভাবে ডানা ঝাঁপটা দিয়ে পালক খসাচ্ছে বাতাসে।

চিৎকার করে ওদেরকে ভাগাতে চাইছি, কিন্তু জিভ এবং ঠোঁট একচুল নড়াতে পারছি না। সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছি আমি। জানি, এবার ওরা নেমে আসবে আমার পাশে, তারপর শুরু করবে। আমার চোখ থেকে। চোখ থেকেই শুরু করে ওরা।

ঠিক যা ভেবেছি। অধৈর্য হয়ে উঠল একটা গাল, শূন্যে ডানা মেলে, গোত্তা খেয়ে নেমে এল আমার কাছাকাছি ডেকে। ডানা দুটো বেশ সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে, যত্নের সাথে ভাঁজ করল সে, তারপর পিঠের পেশী নেড়ে ভাজের অবশিষ্ট ক্রটিগুলো দূর করে খাপে খাপে বসিয়ে নিল। গুনে গুনে দুই পা আরও সামনে এগোল। সে। পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে আছি আমরা। আবার আমি চিৎকার করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না। হেলেদুলে আবার দুই পা এগোল গালটা। তারপর লম্বা করে দিল। তার গলাটা, নির্ভুর ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে যাচ্ছে-গলার ভিতর থেকে কর্কশ চিৎকার বেরিয়ে আসতে শুরু করল। হঠাৎ আমার আতঙ্কিত চোখের পলক পড়তে দেখে টের পেয়ে গেল সী-গালটাবেঁচে আছি আমি!

চট করে দুপা সরে গেল পাখিটা, কর্কশ চিৎকারের সুর। বদলে গেল। বাকি দুটো সী-গাল বাতাসে ডানা ঝাঁপটাচ্ছে। দুঃসাহসী গালটা মাথা নেড়ে অভিশাপ দিল আমাকে, আশাভঙ্গের। ক্ষোভে চঁচামেচি করতে করতে ডানা মেলে উড়ে গেল। তার পাখনার বাতাসের ঝাঁপটা লাগল আমার মুখে। ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ওদের চিৎকার।

ওরা চলে যাবার পর আর কোন শব্দ নেই। রোদ চড়ছে, ঘামছি আমি। মাত্র সকাল, সেই সন্ধে পর্যন্ত রোদে সেদ্ধ হব আমি? না, তা সেদ্ধ হব না-অতক্ষণ বেঁচে থাকার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না।

নতুন, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে না, জানি। বোটটা যদিও। থেমেছে বলে অনুমান করছি সেদিকে দ্বীপবাসীরা ভুলেও কদাচ আসে না, আর নৌকা বা বোট চলাচলের পথ থেকে এটা শুধু অনেক দূরের জায়গা নয়, দৃষ্টিপথের আড়ালেও বটে।

নড়তে না পারলে আমার কি করার আছে! নিজের সাথে তর্ক করছি আমি। এই সময় মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গেল সম্পূর্ণ নতুন একটা শব্দ শুনে। কে যেন বোটের গা আঁচড়াচ্ছে।

প্রথমে মস্ত কালো কামানো মাথাটা ডেক লেভেলের উপর উঠল, তারপর কালো কুচকুচে কপালটা দেখতে পেলাম, সবশেষে দুটো চোখ। ডেকের ওপর একপাক ঘুরে আমার চোখে স্থির হল ওর দৃষ্টি। প্রকাণ্ড মুখটায় সহানুভূতির একবিন্দু ছাপও নেই, রাগে সেটা আরও কদর্য হয়ে উঠেছে। বোটটাকে আবার তুমি...মাসুদ, আই হেট ইউ, ম্যান! আই হেট ইউ... উঠে আসছে ও।

কত কথা বলতে চাইছি, ওকে আমি কসম খেয়ে বলতে চাইছি আর কখনও জলকুমারীকে নোংরা হতে দেব না। বলতে চাইছি, খুশির সাথে দান করে দেব ওকে বোটটা। বলতে চাইছি, ওকে দেখে আমি কত খুশি হয়েছি তা যেন কেউ আমাকে ব্যাখ্যা করতে না বলে, ওটা আমার পক্ষে শ্রেফ অসম্ভব একটা কাজ। বলতে চাইছি...কিন্তু হায়, কিছুই বলতে পারছি না আমি।

উঠে এসে আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রডরিক। নিঃশব্দে পানি গড়াচ্ছে আমার চোখ দিয়ে, সেদিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে কয়েক সেকেণ্ড অপলক তাকিয়ে থাকল ও। তারপর ডেকের জমাট বাঁধা রক্তের উপর দ্রুত আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার, কোমরের বেল্ট থেকে লম্বা পাতের ছুরিটা হ্যাঁচকা টানে বের করে নিয়ে এগোল সেলুনের দিকে।

বোটে আর কেউ নেই দেখে একটু পরই ফিরে এল রডরিক। নিঃশব্দে আমার মাথাটা তুলে নিল কোলে। ক্ষতগুলো পরীক্ষা করল ধীরেসুস্থে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, এসে যখন পড়েছি, তখন যে কথাটা কক্ষণো কোনদিন বলিনি তোমাকে মাসুদ, সেই কথাটা এখন বলেই ফেলি-আই লাভ ইউ, ম্যান। আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসি আমি তোমাকে... সরল স্বীকারোক্তিটা শেষ করেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে।

আট

তীব্র ব্যথায় ছটফট করছি আমি। হাসপাতালের সব কজন নার্স, পাঁচজন, চেপে ধরে আছে আমাকে। চীফ সার্জেন জেমস ডানিয়েল হাস্য রসে আক্লত হয়ে উঠল। হা হা করে হাসছে সে। পরমুহূর্তে চোখ রাঙাল, বলল অ্যাঁই! জোয়ান ছেলে, একটুতেই এত কিসের চঁচামচি? এই বয়সে অমন একটু কেটে-ছিড়ে যায়-ই তাতে হয়েছেটা কি? কথা শেষ করে আবার সে নির্মমভাবে একটা সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ঢুকিয়ে দিল আমার বুকের ক্ষতটায়।

আবার আমি চিৎকার করে উঠলাম। গায়ে যদি একটু জোর থাকত, ওই প্রোবটা আমি ডানিয়েলের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় ঢুকিয়ে দিতাম। মরফিন ব্যবহার করতে কেউ শেখায়নি তোমাকে, ডাক্তার? কোথেকে পাস করেছ...?

ঘুরে আমার মুখের সামনে চলে এল সে। বয়স পঞ্চান্ন, গায়ের রঙ তামাটে, জলহস্তীর মত মোটাসোটা শরীর, মুখে এমন দুর্গন্ধ যে তাতেই জ্ঞান হারাবার কথা রোগীদের-এই হল সরকারি হাসপাতালের চীফ সার্জেন জেমস ডানিয়েল। রানা, মাই বয়, ওই জিনিসটার ভারী দাম। তুমি কি? জানতে চাইল সে, ফ্রি চিকিৎসা প্রার্থী, নাকি প্রাইভেট পেশেন্ট?

প্রাইভেট! প্রাইভেট! চঁচিয়ে উঠলাম।

মুখ ফুলিয়ে হাসল ডানিয়েল। এতক্ষণ বলনি কেন? খামোকা কষ্ট পেলে! সিস্টারের দিকে তাকাল সে, বলল, যাও তাহলে, মি. মাসুদ রানার জন্যে দামি জিনিসটার এক ফোটা নিয়ে এসো।

মরফিনের অ্যাম্পুল নিয়ে এসে ইঞ্জেকশনটা তৈরি করেছে। সিস্টার, এই ফাঁকে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করেছে ডানিয়েল। বলল, একদম মরুভূমি হয়ে গিয়েছিলে, মাই বয়! গতরাতে এক এক করে ছয় পাইন্ট রক্ত চুষে নিয়েছে তোমার শরীর। তবে, বুলেটটা বের করতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলে...

কদ্দিনে সেরে উঠব, ডাক্তার?

একমাসের বেশি নয়।

একমাস! উঠে বসার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলাম, কিন্তু আরও শক্ত করে চেপে ধরল আমাকে চারজন নার্স। অসম্ভব! হাপাতে শুরু করে বললাম আমি। মওসুমটা মাঠে মারা যাবে তাহলে। আগামী হপ্তায় নতুন পার্টি আসার কথা...।

সিস্টার ঘাঁচ করে সিরিঞ্জের সূচ বিঁধিয়ে দিল আমার বাহুতে।

এই মওসুমের কথা ভুলে যাও, মাই বয়। আগামী বার বেশি করে মাছ ধরে পুষ্টিয়ে নিয়ো। আবার ডানিয়েল মাংসের ভিতর থেকে খুঁজেপেতে হাড়ের টুকরো বের করতে শুরু করল।

মরফিনের প্রভাবে ব্যথাটা কমেছে, কিন্তু হতাশায় মুষড়ে পড়েছি আমি। এমনিতেই এবারের মওসুমে অনেক দেরি করে এসেছে মাছ, অবশিষ্ট কটা দিন যদি কাজে লাগাতে না পারি আবার আমি চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়ে যাব।

ধবধবে সাদা নতুন ব্যাগেজ দিয়ে ক্ষতগুলো আবার বেঁধে দিল ডানিয়েল। এবং কৌতুক ও আশ্বাসের সুরে পেট থেকে আরও কিছু দুঃসংবাদ খালাস করল। বলল, বাঁ হাতটা বেশ কিছুদিন অসহযোগিতা করবে তোমার সাথে, মাই বয়। কাজ করবে, কিন্তু সব কাজ নয়। তাছাড়া, মেয়েদেরকে দেখাবার জন্যে শরীরে সুন্দর কিছু দাগ পাচ্ছ তুমি। সিস্টারের দিকে তাকাল সে, বলল, ছয় ঘন্টা পর পর বদলাতে হবে ড্রেসিং। মাইসিটিন ক্যাপসুলের চলতি ডোজ চারঘন্টা পর পর দিতে থাক। আজ রাতে তিনটে মোগাডোন দেবে। কাল সকালে আবার ওকে দেখব আমি। তারপর আবার আমার দিকে তাকাল সে, বিশৃঙ্খল গোঁফের নিচে নোংরা হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার, নিঃশব্দে একটু হেসে জানাল, এই কেবিনের ঠিক বাইরে গোটা পুলিশ বাহিনী অপেক্ষা করছে, এখন তাদেরকে এখানে ঢুকতে না দিয়ে উপায় নেই। আমার। দরজার দিকে এগোল সে, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, নাইস শূটিং, রানা বয়। একা দুজনকে যেভাবে সামলেছ-তুলনা হয় না! কি করেছিল ওরা? তোমার গার্ল ফ্রেণ্ডকে ফুল ছুঁড়ে মেরেছিল নাকি? হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল সে।

কড়া ভাঁজের ইন্সট্রিক্ট করা ইউনিফর্ম পরেছে ইন্সপেক্টর টালি। সন্দেহ নেই, চামড়ার বেল্ট, স্ট্র্যাপ আর মেডেলগুলো আজ আবার পালিশ করেছে সে।

গুড আফটারনুন, মি. রানা...

স্যার... মনে করিয়ে দিলাম আমি।

আমার দিকে একদৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল টালি, তারপর কি মনে করে দরজার দিকে তাকাল একবার। আমি জানি, ভিতরে ঢোকার অনুমতি নেই বলে বাইরে বসে আছে। রডরিক। টালি সম্ভবত তার কথা মনে রেখেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিল।

বলল, মি. রানা, স্যার, আপনার একটা জবানবন্দী নিতে এসেছি আমি। আশা করি আপনি এখন যথেষ্ট সুস্থ বোধ করছেন।

আপনাকে দেখার পর শুধু সুস্থ নয়, রীতিমত উৎসাহ বোধ করছি, ইন্সপেক্টর।

সাব ইন্সপেক্টর টমসন প্যাড আর পেন্সিল হাতে কেবিনে। ঢুকল, সোজা এগিয়ে এসে বসল আমার বিছানার একপাশে। মুদু গলায় বলল, আপনি আহত হয়েছেন শুনে খুব দুঃখ পেয়েছি, মি. রানা। এমন একজনও নেই দ্বীপে যে আপনাকে প্রত্যেকদিন দেখার জন্যে আসে না, কিন্তু ঢুকতে দেয়া হয় না বলে রোজ সবাই ফিরে যাচ্ছে...সাংঘাতিক চোট পেয়েছেন, তাই না, মিস্টার রানা?

ধন্যবাদ, টমসন। ওদের দুজনকে যদি দেখতে, এ কথা বলতে না ভুমি।

রডরিকের এগারোজন ভাগের একজন এই টমসন, ওর মা আমার জামা কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে দেয়। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন, কালো এবং অল্পবয়েসী যুবক টমসনই হতে যাচ্ছে সেন্ট মেরীর পরবর্তী পুলিশ বাহিনী প্রধান।

দেখেছি-মাই গড! চোখ কপালে তুলল টমসন। সহানুভূতিসূচক একটা চুক চুক শব্দ করল, তারপর বলল, কার সাথে লাগতে যাচ্ছে তা যদি আগে বুঝতে পারত ওরা...।

আপনি তৈরি, মিস্টার রানা? অস্বস্তি বোধ করছে টালি।

সম্পূর্ণ, বললাম তাকে। তারপর সুন্দরভাবে গুছানো গল্পটা শোনালাম। সব ভাল গল্পের মত এটাও সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি, কিছু কিছু কথা শুধু উল্লেখ করা হল না। সাগর থেকে নিরোর তোলা সাত রাজার ধন বিগ গাল আইল্যান্ডের কাছে আবার আমি ডুবিয়ে দিয়েছি-এ প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ চেপে গেলাম। কোন এলাকায় সার্চ করেছি আমরা তাও জানালাম না। কিন্তু বারবার এ প্রসঙ্গে ফিরে আসতে চেষ্টা করছে টালি।

কি খুঁজছিল ওরা?

বলতে পারব না। চেষ্টার ক্রটি করিনি, কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। আমাকে জানতে দেবে না বলে সাংঘাতিক সতর্ক ছিল ওরা।

কোথায় ঘটল এসব? আবার জিজ্ঞেস করল টালি।

হেরিং বোন রীফ ছাড়িয়ে, রাসতাফা পয়েন্টের দক্ষিণে গানফায়ার ব্রেক-এর কাছ থেকে এ-জায়গাটা পঞ্চাশ মাইল দূরে।

যেখানে ওরা ডাইভ দিয়েছিল, ঠিক চিনতে পারবেন আপনি?

মনে হয় না। কয়েক মাইল এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে। আসলে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে ব্যস্ত রেখেছিল ওরা আমাকে। কোনদিকে ভাল করে নজর দেবার সময় পাইনি।

চিন্তিতভাবে দাঁত দিয়ে গোঁফের রোয়া কামড়াচ্ছে টালি। আপনি বলছেন, কিছু বুঝতে না দিয়ে ওরা আপনাকে আক্রমণ। করে বসে-এখন বলুন, ওরা আপনাকে খুন করতে চাইল কেন?

সত্যি কথা বলব?

অবশ্যই!

ওদেরকে জিজ্ঞেস করিনি আমি, বললাম টালিকে। জিজ্ঞেস করার সময়ই পাইনি। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে আমার তাই বেশি কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছি না-ভুলভাল হয়ে গেলে ফ্যাসাদে পড়ে যাব। আমাকে লক্ষ্য করে প্যানথার যখন গুলি ছুঁড়তে শুরু করল, তখন ভুলেই গিয়েছিলাম, পুলিশে রিপোর্ট করার জন্যে কারণটা জেনে নেয়া দরকার...

এটা ঠাট্টার বিষয় নয়, মি. রানা! চোখ রাঙাল ইন্সপেক্টর টালি।

বিছানার পাশের বোতামে চাপ দিয়ে বেল বাজালাম আমি, সাথে সাথে কেবিনে ঢুকল সিষ্টার। বললাম, আমি অসুস্থ বোধ করছি।

এবার যেতে হয়, ইন্সপেক্টর, বলল সিষ্টার। টালিকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগই দিল না সে। পথ দেখিয়ে বাইরে পৌঁছে দিয়ে এল পুলিশ দুজনকে।

সরকারিভাবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারও সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কেবিনের বাইরে রাতদিন চব্বিশ ঘন্টার জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করেছে। ইন্সপেক্টর টালি। হাসপাতালের সবাই জানে খুনের অভিযোগে বিচার হবে আমার।

পরবর্তী তিনদিন নিরুপদ্রব পরিবেশে প্রচুর চিন্তাভাবনা করার অবকাশ পেলাম আমি। কেবিনের জানালা দিয়ে ফুলের বাগান দেখা যায়। অনেক দূরে পাথরের বিশাল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দুর্গ, ব্যাটলমেন্টের উপর বসানো কামান ইত্যাদি চোখে পড়ে। খুব ভাল খাবার দেয় সিষ্টার মে, তার সাথে বেগম রডরিকের পাঠানো প্রচুর মাছ, প্রচুর ফলপাকড় যোগ হয়। ল্যাম্পনি একজন নার্সকে ঘুষ দিয়ে একবোতল ভুইস্কি পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছে আমার বালিশের নিচে। সিষ্টার মে-র মুখে শুনেছি গোটা দ্বীপের সবাই নাকি আমার সুস্থতার জন্যে গির্জায়, মন্দিরে আর মসজিদে প্রতিদিন প্রার্থনা করে। ব্ল্যাক্স আর প্যানথারকে পুরানো গোরস্থানে কবর দেয়া হয়েছে এবং সবাই আশা করছে এক বছরের মধ্যেই গোরস্থানটা সাগরতলে নেমে যাবে।

এই তিনদিন চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, বিগ গাল আইল্যান্ডের কাছে যে পোঁটলাটা ডুবিয়ে রেখেছি সেটা আপাতত আরও কিছুদিন ওখানেই থাকবে। অনুমানে বুঝতে পারছি, এখন থেকে অনেকগুলো চোখ আমার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। কেন, বা তারা কারা-এসব কিছুই আমি জানি

না। কিন্তু বুঝতে পারছি, যা ঘটেছে তার ফলে আমার জীবন এখন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কোন্‌দিক থেকে বুলেট ছুটে আসবে তা যতক্ষণ জানতে না পারছি, ততক্ষণ দিগন্তরেখার নিচে মাথাটা নামিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ঘুরেফিরে বারবার মনের মধ্যে ফিরে এল নিরো ছেলেটার কথা। চিনি না, আগন্তুক-এইসব বলে নিজেকে প্রবোধ দিতে চাইলাম বটে, কিন্তু কাজ হল না। ওর কথা মনে পড়লেই দুঃখে ফেটে যেতে চায় বুকটা। অথচ এই ধরনের ভাবাবেগকে কোনদিন প্রশ্রয় দিতে অভ্যস্ত নই আমি। আসলে নিরোর সরলতাটুকু ভাল লেগে গিয়েছিল আমার। তাছাড়া, এমন রোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার শিকার হতে দেখেছি ওকে!

তিনদিন কেটে যাবার পর আগের চেয়ে অনেক সুস্থ লাগছে নিজেকে আমার। কারও সাহায্য ছাড়াই এখন আমি বিছানায় উঠে বসতে পারি।

হাসপাতালে আমার কেবিনেই অনুষ্ঠিত হল বিচার বিভাগীয় তদন্ত। তদন্ত এবং রায় একই সাথে হয়ে যাবে তা আমি ঘুণাঙ্করেও ভাবিনি। কিন্তু আমাকে হতচকিত করে দিয়ে ঠিক তাই ঘটে গেল।

অধিবেশন বসল রুদ্ধদ্বার কক্ষে। এতে অংশগ্রহণ করলেন দেশের প্রধান বিচারপতি, প্রধান প্রশাসক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা।

প্রধান প্রশাসক অর্থাৎ মহামান্য প্রেসিডেন্ট স্বয়ং চিরাচরিত রীতি অক্ষুন্ন রেখে সাদা একটা শার্ট ছাড়া সম্পূর্ণ কালো পোশাক পরে এসেছেন। দীর্ঘদেহী প্রধান বিচারপতি শার্কনেস সাহায্য। করছেন তাঁকে। আর নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে হাজির হয়েছে। ইন্সপেক্টর টালি।

সবচেয়ে আগে আমার আরাম এবং অসুস্থতা সম্পর্কে প্রচণ্ড উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রেসিডেন্ট। কেন জানি না, তাঁর প্রিয় পাত্রদের মধ্যে আমাকেও তিনি একজন বলে গণ্য করে থাকেন।

মিস্টার রানা, সবচেয়ে আগে নিজেকে তুমি সবল করে। তোল। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় আবার মাছ ধরতে দেখতে চাই। বাস, আমার বলার কথা এটুকুই! কোনও ব্যাপারে দুশ্চিন্তা কর, এ

আমি চাই না-এখানে কেউ আমরা তোমার বিপদ বাড়াবার জন্যে আসিনি-রাইট? মহামান্য প্রেসিডেন্ট অন্যান্যদের দিকে তাকালেন।

ইন্সপেক্টর টালিকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। এর জন্যে ওকে দোষ দেয়া যায় না। বিচার পর্ব শুরু হবার আগেই সুস্পষ্ট রায় হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত ন্যায় বিচারের ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

গুহানো গল্পটা আবার একবার মুখস্থ বলে গেলাম আমি। ছোট কাহিনী, কিন্তু প্রচুর সময় লাগল শেষ করতে। তার কারণ বারবার আমাকে বাধা দিলেন প্রেসিডেন্ট। ঘটনার মধ্যে আমার প্রতিটি আচরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তিনি, ক্ষতের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে কয়েকবার আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। হাসি মুখে তীব্র ব্যথা হজম করলাম প্রতিবার। আমার বক্তব্য শেষ হতে সবিস্ময়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন নিঃশব্দে, তা প্রায় ঝাড়া আধ মিনিট ধরে।

তারপর বললেন, ওই গুণাদের বিরুদ্ধে তুমি যা করেছ, মিস্টার রানা, বীরত্বের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মত, অন্যান্যদের দিকে তাকালেন তিনি, রাইট, জেন্টলমেন?

আন্তরিকতার সাথে ঘাড় নেড়ে সাই দিলেন প্রধান বিচারপতি শার্কনেস। কিন্তু টালি চুপচাপ থাকল।

এবং সত্যিই গুণা ওরা, প্রেসিডেন্ট বলে চলেছেন, ওদের হাতের ছাপ লগুনে পাঠানো হয়েছিল, আজ উত্তর এসেছে-ওরা এখানে ছদ্ম পরিচয় নিয়ে এসেছিল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ওদের নামে ফাইল আছে। গুণা, কুখ্যাত গুণা-দুজনেই। প্রধান বিচারপতির দিকে তাকালেন তিনি। কোন প্রশ্ন, প্রধান বিচারপতি?

আমার কোন প্রশ্ন নেই, মি. প্রেসিডেন্ট।

গুড। ভেরি গুড। খুব খুশি হলেন প্রেসিডেন্ট।

তোমার ব্যাপারটা কি, ইন্সপেক্টর?

টালি টাইপ করা একটা প্রশ্নমালা বের করল পকেট থেকে।

এসব আবার কি? ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। ও, প্রশ্ন। বেশ, বেশ। কিন্তু ফালতু কোন প্রশ্ন টুকে আনোনি তো? ওতে এমন কোন প্রশ্ন নেই তো যার ফলে উত্তর দিতে অসুবিধে হবে মিস্টার রানার, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন?

টালি ইতস্তত করছে।

প্রেসিডেন্ট কালক্ষেপ না করে বলে বসলেন, বেশ। ঝামেলা চুকে গেল। তদন্তে জানা গেল, মিস-অ্যাডভেঞ্চারের পরিণতিতে মৃত্যু হয়েছে ওদের। মিস্টার রানা স্বেচ্ছা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছেন, সুতরাং তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। বেকসুর খালাস পেলেন তিনি। কেবিনের একধারে বসা স্টেনোগ্রাফারের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। সব লিখে নিয়েছ তো? টাইপ করে একটা কপি আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো, সই করে দেব। চেয়ার ছেড়ে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এবার গা ঝাড়া দিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠ, মিস্টার রানা। তাড়াতাড়ি আবার গভর্নমেন্ট হাউজের ডিনারে দেখতে চাই তোমাকে আমি। আমার সেক্রেটারি তোমাকে আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবে। তোমার অসম সাহসিকতার কাহিনীটা আগাগোড়া আরেকবার শুনতে চাই আমি।

আবার যখন বিচারের সম্মুখীন হব, ভাবলাম, তখনও যেন এইরকম বিবেচনার আনুকূল্য পাই আমি। সরকারি ভাবে আমাকে নিরপরাধ ঘোষণা করা হয়েছে, সুতরাং শুভানুধ্যায়ীরা আমার সাথে দেখা করার অনুমতি পেল।

কেবিনে ঢুকল না রডরিক আর ল্যাম্পনি, দরজার কাছে। দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ভিড় সামলাতে ব্যস্ত ওরা। একজন করে লোককে। একমিনিট সময়ের জন্যে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে ওরা, সে বেরিয়ে গেলে আরেকজনকে ঠেলে দিচ্ছে কেবিনের ভিতর। সবচেয়ে আগে সুযোগ পেল কালো মাণিকের দল। তারপর মেয়েদেরকে সাথে নিয়ে এল মা এডি। মালভূমি থেকে এসেছে খেত মজুর আর মেয়ে শ্রমিকরা। হিলটনের ম্যানেজার থেকে শুরু করে টেলিফোন অপারেটর মারিয়া, ওরাও দেখতে এল আমাকে। তারপর এল পাকা আপেলের মত এক ষোড়শী, জুডিথ। আমার। কানে কানে প্রেম নিবেদন করল সে।-আমাকে নয়, ল্যাম্পনিকে। তাকে কথা দিলাম তার সমস্যার একটা সমাধান অবশ্যই করব আমি। যাবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করল জুডিথ, ফেঁসে গিয়ে

সে কি ভুল করেছে? তাকে বললাম, ল্যাম্পনিকে ক্রু হিসেবে পেয়ে আমি গর্বিত। তাকে স্বামী হিসেবে যে পাবে সে তো মহা ভাগ্যবতী। খুশি মনে বিদায় নিল সে।

সবশেষে কেবিনে চুকল রডরিক আর বেগম রডরিক। ওদের বিয়ের জমকালো পোশাক পরে এসেছে ওরা। বেগম রডরিক আমার জন্যে তৈরি করে এনেছে সুস্বাদু ব্যানানা কেক, এর প্রতি আমার দুর্বলতার কথা জানা আছে তার।

আমাকে প্রায় সুস্থ দেখে স্বস্তি আর আনন্দে দেয়ালে ঠুকে মাথাটা শুধু ভেঙে ফেলতে বাকি রাখল রডরিক। তারপরই কর্কশ গলায় গাল পাড়তে শুরু করল আমাকে সে। মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে উল্টে গিয়ে বুলডগের মত দাঁড়াল চেহারাটা।

বলে চলেছে, জলকুমারী একদম শেষ হয়ে গেছে। ডেকটাকে আর কোনদিন পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। রক্ত শুষে নিয়েছে, ম্যান। আর তোমার ওই পাজি কারবাইনটা কেবিনের বাল্কহেডটাকে চুরমার করে দিয়েছে। ল্যাম্পনিকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তিনদিন ধরে আঠারো ঘন্টা করে খেটেও আমরা আগের চেহারা ফিরিয়ে আনতে পারিনি-আরও কয়েকটা দিন লাগবে।

দুঃখিত, রডরিক। এরপর কাউকে গুলি করার দরকার হলে। আগে তাকে বোটের কিনারায় দাড়াতে বলব-কথা দিলাম তোমাকে। আমি জানি, রডরিক আর ল্যাম্পনি মেরামতের কাজ শেষ করার পর একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না বোটে।

ওসব বুঝি না, দরজা পেঁরিয়ে কেবিনে চুকল ল্যাম্পনি, রডরিক, শালা বসকে জিজ্ঞেস কর, মাছ ধরতে বেরোচ্ছে কবে?

কবে? জিজ্ঞেস করল রডরিক।

খুব বেশি দেরি হলে আজ থেকে সাতদিন পর।

ষ্ট্রীমে বড় বড় সব মাছ দেখা যাচ্ছে, বস্, বলল ল্যাম্পনি। আমরা নেই বলে সবগুলো নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছে।

ওদিকে শুনলাম রামাদীন নাকি তোমার সব পার্টিকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছে যে তুমি সাংঘাতিক অসুস্থ, তোমার বদলে তারা ইচ্ছা করলে মিস্টার ডনম্যানের বোট চাটার করতে পারে।

কী! মেজাজ বিগড়ে গেল আমার। চিৎকার করে বললাম, যাও তো, ল্যাম্পনি, রামাদীনকে এম্ফুনি ধরে নিয়ে এসো! ধরে আনতে বললে অবশ্যই তাকে বেঁধে নিয়ে আসবে ল্যাম্পনি, তাই পিছন থেকে আবার চিৎকার করে বললাম, ধরে নয়, ডেকে নিয়ে আসবে।

হোটেল হিলটনের সাথে ডিক ডনম্যানের চুক্তি আছে। দুটো বড় আকারের গেইম ফিশিং বোট কিনে ডনম্যানকে ভাড়া। দিয়েছে ওরা, ডনম্যান বিদেশ থেকে দুজন স্কিপার আনিয়ে বোট দুটো চালায়। আন্তরিকতার অভাবে মাছ ওরা ধরতেই পারে না, তাই কপালে চাটারও জোটে না। বুঝতে পারছি আমার অসুস্থতার সুযোগে ডনম্যানের কাছ থেকে মোটা কমিশন খাবার লোভ ছাড়তে পারেনি রামাদীন।

এতই ব্যস্ত সে, দ্বীপের কোথাও তার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেল না ল্যাম্পনি। খবর পেয়ে পরদিন নিজেই এল হাসপাতালে।

প্রথমেই বলতে চাই, আমার কোন দোষ নেই, বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে চ্যাঙা রামাদীন শুরু করল, নাকের ডগায় নেমে আসা চশমার ফ্রেমের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে। আমার দিকে। ডাক্তার ডানিয়েলের কাছ থেকে জেনেছি এমওসুমে আপনার মাছ ধরা লাটে উঠেছে। সেজন্যে আমি তো আর আমার ব্যবসা লাটে তুলতে পারি না। ছয় হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে এসে তারা যদি দেখে আপনি শয়্যাশায়ী, ফুস করে। পাংচার হয়ে যাবে আমার প্রেস্টিজ আর ব্যবসার গুডউইল। আপনাকে আমি ভয় করি, কিন্তু তবু আমি তা হতে দিতে পারি না। আমার বেনিয়া বাপ-মারা যাবার আগে রুটি-রুজির প্রশ্নে আপোস করতে নিষেধ করে গেছেন আমাকে। কথার শেষে ঠোঁটে একটা গোবেচারা টাইপের হাসি টানল সে।

আপনার ব্যবসার গুডউইল আর নর্দমার দুর্গন্ধ, এদুটো একই জিনিস বলে শুনেছি, বেশি কিছু বললাম না ওকে, কারণ ওর কথায় যুক্তি আছে।

তবে কথা হল এই যে, হাত নেড়ে আশ্বাস দিল আমাকে রামাদীন, নিজের ওপর দরদ আছে আমার, তাই আপনাকে আমি পথে বসাব না। দয়া করে সুস্থ হয়ে উঠুন শুধু, সাথে সাথে ডজনখানেক লোভনীয় চাটারের ব্যবস্থা করে দেব আমি।

ইঞ্জিতটা পরিষ্কার। আবার নাইট ডিউটির লোভ দেখাচ্ছে আমাকে রামাদীন। এতে ওরও প্রচুর লাভ, প্রতি ড্রিপে কম করেও সাড়ে সাতশো ডলার কমিশন পাবে। আর আমার এই শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এ-কাজ অনায়াসে করতে পারব আমি। জলকুমারীকে শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, তার বেশি কিছু নয়। বিপদের ঝুঁকি যে নেই তা নয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বিপদে পড়িনি আমরা। আঁটঘাট বেঁধেই একাজে হাত দেয়া হয়। গোলমাল পাকাতে পারে যারা তাদেরকে সন্তুষ্ট করার কায়দা জানা আছে রামাদীনের।

কিন্তু যতই লোভ দেখাক রামাদীন, আমার মন সায় দিচ্ছে না। লোভ হচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে এ-ও বুঝতে পারছি, বেশি রোজগারের এই সর্পিল পথ আমার জন্যে নয়।

ভুলে যান কথাটা, বললাম ওকে। আপনাকে এর আগেও বহুবার বলেছি, এখন থেকে শুধু মাছ ধরব আমি।

ঠিক আছে, অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ঢ্যাঙা রামাদীন। তারপর চোখ পিট পিট করে তাকাল আমার দিকে। মুখে অদ্ভুত এক আবেশের ভাব ফুটিয়ে তুলে হাসল সে, বলল, আপনার ইচ্ছার ওপর জোর নেই। কিন্তু কথা হল এই যে কয়েকটা পুরানো মক্কেল আপনার খাঁজে আমাকে জ্বালিয়ে মারছে। আপনার ওপর ওদের খুব ভক্তি। চোখ দুটো প্রায় বুজে এল রামাদীনের। আমার তো বিশ্বাস, ওদেরকে আপনি জাদু করে ছেড়ে দিয়েছেন, তাই আপনার কথা আজও ভুলতে পারছে না। যাই হোক, কি আর করা, নিষেধ করে দিই ওদেরকে...

চতুর রামাদীনের কৌশল কাজে লেগে গেল, শত চেষ্টা করেও কৌতূহল দমন করতে পারলাম না আমি, জানতে চাইলাম, বডি? না, বক্স?

বডি হল আফ্রিকা মেইনল্যান্ড থেকে বা মেইনল্যান্ডে গোপনে মনুষ্য পাচার করা। নতুন সরকারের রোষানলে পতিত কোন রাজনীতিক হয়ত দেশ ছেড়ে পালাতে চায় অথবা কোন বিপ্লবী সংগঠনের নির্বাসিত নেতা হয়ত বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার মানসে দেশে ফিরতে চায়। আর বক্স হল আগ্নেয়াস্ত্র পাচার।

এদিক-ওদিক মাথা দোলাল ঢ্যাঙা রামাদীন, সুর করে ছড়া। কাটল, ফাইভ, সিক্স-পিকআপ স্টিকস। নার্সারীতে পড়ানো হয় ছড়াটা। এখানে স্টিক বলতে বোঝাচ্ছে আইভরি, হাতির দাঁত। অত্যন্ত সুসংগঠিত একটা দল সুপরিকল্পিত ভাবে পূর্ব আফ্রিকার সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং আদিবাসী এলাকা থেকে অবৈধভাবে হাতির বংশ ধ্বংস করে চলেছে। হাতির দাঁতের মস্ত একটা বাজার রয়েছে দূর প্রাচ্যে। উপকূলবর্তী দ্বীপপুঞ্জের গোলকর্ধাধা থেকে এই মূল্যবান কার্গো বয়ে নিয়ে আসার জন্যে দরকার শুধু দ্রুত গতিসম্পন্ন একটা বোট আর দক্ষ একজন স্কিপার। খোলা সাগরে সমুদ্রগামী জাহাজ অপেক্ষা করছে, তাতে কার্গো তুলে দিলেই প্রচুর নগদ নারায়ণ।

গোখলে রামাদীন, বললাম ওকে, আপনার জননী নিশ্চয়ই আপনার পিতার নাম জানতেন না...

হে হে করে হাসল নির্লজ্জ লোকটা, বলল, কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সিনিয়র মি. রানা অর্থাৎ আপনার কোটিপতি পিতার সাথে আমার জননীর কখনও পরিচয় হয়নি। পরমুহূর্তে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল সে। এধরনের রসিকতা কাজের প্রতি উৎসাহ বাড়ায়। বিলিভ মি, এসব আমি পছন্দ করি। শুনুন তবে, পার্টিদেবকে আমি জানিয়ে দিয়েছি আগের রেটে আর ডাল গলবে না। মুদ্রাস্ফীতি, তার ওপর ডিজেল ফ্যুয়েলের দাম যেভাবে বাড়ছে..

কি রেট দিয়েছেন ওদেরকে?

প্রতি ড্রিপে সাত হাজার ডলার, টপ করে বলল রামাদীন। দুচোখে প্রত্যাশা নিয়ে লক্ষ করছে সে আমাকে।

সাত হাজার ডলার, খুব বেশি নয়। রামাদীনের পকেটে যাবে শতকরা পনেরো ভাগ, আর চোখ কান বুজে রাখার বিনিময়ে ইন্সপেক্টর টালিও ওই হারে ঘুষ খাবে। এর ওপর, এ ধরনের নাইট ডিউটিতে

ডেঞ্জার মানি হিসেবে রডরিক আর ল্যাম্পনি প্রতি ট্রিপে পাঁচশো ডলার করে এক হাজার ডলার পেয়ে আসছে।

না, বললাম ওকে। মাছ ধরতে চায় এমন দুএকটা পার্টি জোগাড় করুন আমার জন্যে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভ আমি সামলাতে পারব না তা আমার চেয়ে বোধহয় ভাল জানা আছে লোকটার। একগাল হেসে সাই দিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, তা তো জোগাড় করবই। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন, মাছ ধরার পার্টির অভাব হবে না। তার আগে, বলুন প্রথম নাইট ডিউটিতে কবে যাচ্ছেন? ওদেরকে আজ থেকে দশ দিন পর আসতে বলে দিই? ওই সময় সাগরে উঁচু স্রোত আর আকাশে একটা চমৎকার চাদ থাকবে।

ফিসফিস করে বললাম, বেশ। আজ থেকে দশ দিন পর।

সিদ্ধান্ত বদল করতে পারি এই ভয়ে দ্রুত বিদায় নিয়ে কেটে পড়ল রামাদীন। তাড়াহুড়োর সময় আমার জন্যে উপহার হিসেবে নিয়ে আসা ফলের ঝুড়িটা আবার সে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এক হপ্তা পর ঘটনাটাকে সে একটা ভুল হিসেবে চালাতে চেষ্টা করল। মুখে কিছু না বললেও তা আমি বিশ্বাস করিনি। কারণ নার্সদের কাছে শুনেছি রোগী দেখতে এসে সব সময়েই নাকি উপহারটা ফিরিয়ে নিয়ে যায় ও মনের ভুলে।

নাইট ডিউটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর দেখা গেল আমার ক্ষতগুলো দ্রুতগতিতে সেরে উঠছে। ছয়দিনের দিন বিছানায় বসিয়ে সিষ্টার মে আমাকে গোসল করাল। দারুণ সেবা করছে মেয়েটা আমার। তবে কাছে আসার আগে প্রতিবার আমার। বেয়াদপ হাত দুটোকে সামলে রাখার জন্যে অনুরোধ করে সে। দেখতে খুব ভাল, তার চেয়ে ভাল ওর সাদা ড্রেস পরা ফিগারটাভঁসা পেয়ারার মত ওকে চিবিয়ে খাবে ওর স্বামী। আমার শারীরিক শক্তির প্রত্যাবর্তন লক্ষ করে একাধারে পুলকিত এবং আতঙ্কিত হল সিষ্টার মে। সিষ্টার রানা, দোহাই, এত জোরে ধরবেন না, কজি ভেঙে যাবে আমার। ওকে ছেড়ে দিলাম আমি, তারপর বলতে শুনলাম, লর্ড! এত শক্তি পেলেন কোথায়?

যেখানেই পাই, জিনিসটা কি নষ্ট হতে দেয়া উচিত হবে আমাদের?

দ্রুত প্রচণ্ড ভাবে মাথা নেড়ে নিরাশ করল ও আমাকে।

নয়

সেদিন থেকে আরও উৎসাহের সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। সবুজ ক্যানভাসে মোড়া রহস্যটা সারাক্ষণ খোঁচা মারছে আমাকে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে বিগ গাল আইল্যান্ড। ধৈর্য ধরার প্রতিজ্ঞা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে, অনুভব করছি। মাত্র এক নজর দেখব জিনিসটা, নিজেকে বললাম। এখুনি নয়, পরিস্থিতি একটু শান্ত হোক...

প্রতিদিন দুএক ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করতে দিচ্ছে ওরা আমাকে। কিন্তু আমি সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে কাজ করার শক্তি চাইছি। আমার অস্থিরতা সিস্টার মে চেষ্টা করেও দমন করতে পারছে না। স্নান মুখে একদিন সে বলেই ফেলল, মেয়েমানুষ-তার চেয়ে বড় নেশা কি হতে পারে?

অ্যাডভেঞ্চার, বললাম আমি। কিন্তু কিছুই বুঝল না সে। সম্ভবত মেয়েমানুষ বলেই বুঝল না প্রকৃতি ওদেরকে মেয়েমানুষ হিসেবেই তৈরি করেছে-পুরুষদেরকে ঘরমুখো করার জন্যে।

ডাক্তার ডানিয়েল তো অবাক। ক্ষতের ফাঁকগুলো এত তাড়াতাড়ি জোড়া লাগছে-এমন তো শুনিনি কখনও! বড় জোর আর এক হপ্টা...

দূর, দূর! তার কথা উড়িয়ে দিলাম আমি। সাতদিন পর নাইট ডিউটিতে যাচ্ছি, তার আগেই সেবে উঠতে হবে আমাকে। সব ব্যবস্থা কোন গোলমাল ছাড়াই পাকা করে ফেলেছে রামাদীন। ইতিমধ্যে পকেট খালি হয়ে গেছে আমার। নাইট ডিউটিতে এখন আমাকে যেতেই হবে।

রোজ সন্ধ্যায় দেখা করতে আসে আমার কুরা। ওদের রিপোর্ট থেকে বুঝতে পারি, দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে জলকুমারীর মেরামতের কাজ। আজ সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশ একটু আগে এল ল্যাম্পনি। ওর সবচেয়ে দামি পোশাক আর জুতো পরে এসেছে ও, কিন্তু কেন যেন আজ ওকে আশ্চর্য সুবোধ আর শান্ত দেখাচ্ছে। একা নয়, সাথে আরেকজনকে নিয়ে এসেছে।

ওর সাথে জুড়িথকে দেখে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলাম। আমার নাক গলাবার আগেই নিজেদের ব্যাপারে ওরা একটা সমাধানে পৌঁছেছে বুঝতে পেরে খুশি হলাম। দুর্গের কাছে সরকারি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী জুড়িথ বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞান দান করে। হাইস্কুল পাস করেছে সবে, দ্বীপে কলেজ থাকলে

আরও পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল। মেয়ে হিসেবে সব দিক থেকে ভাল, ছন্নছাড়া ল্যাম্পনিকে কেউ যদি বাঁধতে পারে, ও-ই পারবে।

হাউ ডু ইউ ডু, মি. রানা, সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসল সে।

হ্যালো, জুডিথ। দুজন একসাথে এসে ভালই করেছ, তারপর ল্যাম্পনির দিকে তাকালাম, এবং চেপে রাখতে না পেরে নিঃশব্দে হেসে ফেললাম আমি। আমার চোখের দিকে অদ্ভুত এক সঙ্কোচে তাকাতেই পারছে না সে। কি বলবে ভেবে না পেয়ে। ঘামছে।

আ-আমি আর জু-জুডিথ বি-বিয়ে... অবশেষে তোতলাতে শুরু করল সে, বিষয়টা তোমাকে জানানো দরকার বলে মনে করলাম, বস্।

ওকে নিজের শাসনে রাখতে পারবে বলে মনে করো, জুডিথ? হেসে উঠে জানতে চাইলাম।

পটলচেরা চোখে ল্যাম্পনির দিকে তেরছা দৃষ্টি হেনে আমাকে বলল সে, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।

চমৎকার-তোমাদের বিয়ের দিন আমি একটা বক্তৃতা দেব, নিশ্চয়তা দিয়ে বললাম। বিয়ের পর আমার সাথে কাজ করতে দেবে তো ওকে?

আপনার কাজ যাতে না ছাড়তে পারে তার জন্যেই তো বিয়ে। করছি ওকে!

তারপর ওরা যখন চলে গেল ক্ষীণ একটু ঈর্ষা বোধ করলাম আমি। আপন করে কাউকে পাওয়া নিশ্চয়ই সুখের অনুভূতিতে ভরে তোলে জীবন। ভাবলাম কোনদিন যদি কখনও মনের মত কাউকে পাই তাহলে বোধহয় চেষ্টা করে দেখব একবার। কিন্তু পরমুহূর্তে বাতিল করে দিলাম ভাবাবেগটাকে, আমার ভেতর একজন পাহারাদার জেগে উঠল। দুনিয়ায় মেয়ে তো অনেকই আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কে আমাকে বুঝবে তা আমি জানব কিভাবে? তাছাড়া নির্বাসিত একজন ছন্নছাড়াকে কষ্ট করে তারা কেউ বুঝতে চেষ্টাই বা করবে কেন?

হাতে দুদিন থাকতে ডাক্তার ডানিয়েল আমাকে মুক্তি দিল। ইতিমধ্যে প্রায় দশ সের ওজন কমে গেছে আমার, চোখের কোণে কালি পড়েছে, এবং অসহায় শিশুর মত দুর্বল বোধ করছি। বা হাতটা এখনও সিঙে ঝুলছে, ক্ষতগুলোর মুখ এখনও খোলা-তবে নিজেই এখন আমি ড্রেসিং বদল করতে পারি।

পুরানো পিকআপটা নিয়ে এসেছে ল্যাম্পনি। সিঁড়ির ধাপে দাড়িয়ে সিষ্টার মে-র কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি।

আপনার সান্নিধ্য পেয়ে খুশি হয়েছি আমি, মিষ্টার রানা।

সময় করে গরিবের বাড়িতে একবার এসো। খিল করা মাছ আর চমৎকার ওয়াইন খাওয়াব। কথা দিচ্ছি, হাত দুটোকে...।

হেসে ফেলে সিষ্টার বলল, আগামী হপ্তায় কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার। লগুনে ফিরে যাচ্ছি আমি।

তাই?

হ্যাঁ, বলল সিষ্টার। বয়-ফ্রেণ্ড অপেক্ষা করছে। বিয়ে করব আমরা। আপনার গল্প শোনাব ওকে।

সুখী হও, মৃদু হেসে বললাম।

গাড়িতে তুলে অ্যাডমিরালটি জেটিতে নিয়ে এল আমাকে ল্যাম্পনি। জলকুমারীতে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল রডরিক। এক ঘন্টা ধরে বোট মেরামতের অগ্রগতি যাচাই করলাম আমরা। ডেকগুলো সাদা তুষারের মত চকচক করছে। সেলুনের সমস্ত কার্ঠের কাজ বাতিল করে দিয়ে সে-সব জায়গায় নতুন করে ভরা হয়েছে। এত সুন্দর হয়েছে জোড়াতালির কাজ যে আমার চোখে কোথাও সামান্য দাগ পর্যন্ত ধরা পড়ল না।

চ্যানেল ধরে জলকুমারীকে সেই মাটন পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম আমরা। ওর ইঞ্জিনের মিষ্টি শব্দ শুনে আর সারা শরীর জোড়া মৃদু কম্পন অনুভব করে পুলকিত হয়ে উঠলাম আমি। সন্ধ্যা লাগতে ফিরে এলাম নোঙর ফেলার জন্যে, অন্ধকার ব্রিজে বসে ক্যান থেকে চুমুক দিয়ে বিয়ার খাচ্ছি আর নিচু গলায় গল্প করছি। ওদেরকে জানালাম আগামীকাল নাইট ডিউটিতে যাচ্ছি আমরা। ওরা জানতে চাইল কোথায় যাব আর কি ধরনের কার্গো। ব্যস, এইটুকু-কোন তর্ক উঠল না।

ফেরার সময় হয়েছে, অবশেষে বলল ল্যাম্পনি। নাইট স্কুল। থেকে জুড়িথকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

ডিঙি নৌকায় চড়ে জেটিতে ফিরলাম আমরা। আমার রঙচটা পিকআপের পাশে পুলিশের একটা ল্যাণ্ড রোভার দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাদেরকে এগোতে দেখে সাব-ইন্সপেক্টর টমসন বেরিয়ে এল সেটা থেকে। তার মামা রডরিকের সাথে কুশল বিনিময়ের পর আমার দিকে ফিরল সে।

দুঃখিত, মিস্টার রানা, বলল টমসন। ইন্সপেক্টর টালি দুর্গে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। খুব নাকি জরুরি ব্যাপার।

আগামীকাল দেখা করলে হয় না?

নিজেই আসছিলেন তিনি, তারপর কি মনে করে আমাকে পাঠালেন, বলল টমসন। আপনি না গেলে আমার ওপর চোটপাট করবেন।

শুধু টমসনের কথা ভেবে যেতে রাজি হলাম আমি। ঠিক আছে, তোমার ল্যাণ্ড রোভারকে ফলো করছি আমি, কিন্তু রডরিক আর ল্যাম্পনিকে পৌঁছে দিতে হবে আগে।

সম্ভবত ঘুষের পরিমাণ নিয়ে দর কষাকষি করতে চায় টালি, ভাবলাম আমি। তাছাড়া আমার সাথে জরুরি আর কি দরকার। থাকতে পারে তার?

একটা হাঁটু দিয়ে স্টিয়ারিঙ ভুইল চেপে রেখে ভাল হাতটা দিয়ে গিয়ার বদল করছি, ড্র ব্রিজ পেরিয়ে লাল বাতি অনুসরণ করে যাচ্ছি ল্যাণ্ড রোভারের। দুর্গের ভেতর ঢুকে উঠানের একপাশে দাঁড় করলাম পিকআপ।

পাহাড় সমান উঁচু পাথরের দেয়ালগুলো দুর্ভেদ্য গাভী নিয়ে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্রীতদাসদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমের ফসল এগুলো। দেয়ালের চওড়া মাথায় থারটি সিক্র পাউণ্ডারের জোড়া কামান বসানো রয়েছে, চ্যানেল এবং এ্যাণ্ড হারবার পর্যন্ত এগুলোর নাগাল।

দুর্গের একটা শাখা জুড়ে দ্বীপের পুলিশ হেডকোয়ার্টার, কারাগার এবং অস্ত্রাগার, বাকি অংশে সরকারি অফিস, প্রেসিডেন্ট ভবন এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা।

পুলিস হেডকোয়ার্টারের সামনের সিঁড়ি টপকে উঠলাম আমরা। পথ দেখিয়ে একপাশের দরজা দিয়ে লম্বা করিডরে নিয়ে এল আমাকে টমসন, সেখান থেকে আবার একটা সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে আরেক করিডরে পৌঁছুলাম। তারপর আরও কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি টপকে নেমে এলাম ছোট্ট একটা উঠানে।

এর আগে দুর্গের এত ভেতরে কখনও আসিনি আমি। সম্ভবত সেজন্যই একটা অস্বস্তি অনুভব করছি। নিরেট পাথরের দেয়ালগুলো এদিকে কম করেও বিশ ফুট চওড়া। উঠান থেকে একটা প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছি। শেষ মাথায় মোটা ওক কাঠের বিশাল দরজা, তাতে লোহার ভারী বার আড়াআড়িভাবে আটকে দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

ভেতরে ঢুকে ইন্সপেক্টর টালিকে দেখলাম। একজন কনস্টেবলকে নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। লক্ষ করলাম, ওরা দুজনেই সশস্ত্র। একটা টেবিল এবং একটা মাত্র চেয়ার ছাড়া পাথরের ঘরটা সম্পূর্ণ খালি। কামরার পেছন দিকে খিলান আকৃতির একটা দরজার ওদিকে দেখা যাচ্ছে একসার সেলের দরজা। সিলিং থেকে নেমে আসা কালো তারের শেষ মাথায় ঝুলছে একশো পাওয়ারের নগ্ন একটা বালব। কামরাটা ঠিক চারকোনা নয়, পাঁচ কোনা। মেঝে আর দেয়ালে কিন্তুতকিমাকার ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার এফ-এন কারবাইনটা পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর।

আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়েই পায়চারি থামাল ইন্সপেক্টর টালি, চরকির মত আধপাক ঘুরে তাকাল আমার দিকে। দরজার ভেতর দিকে ভারী বার-টা ঘটাং করে তুলে দেবার শব্দ হল আমার পেছনে।

দুই পা এগিয়ে এসে কোমরে জড়ানো হোলস্টারের পিস্তলটায়। একটা হাত রাখল ইন্সপেক্টর টালি, অপর হাতটা টেবিলের দিকে তুলে বলল, মাসুদ রানা, ওটা তোমার ফায়ার আর্ম? স্যার তা নয়ই, মিস্টার পর্যন্ত উচ্চারণ করল না সে।

তুমি জানো ওটা কার, রাগের সাথে বললাম তাকে, আসলে মতলবটা কি, ইন্সপেক্টর?

রানা, অবৈধ ভাবে একটা ক্যাটাগরি এ ফায়ার আর্ম সাথে। রাখার জন্যে তোমাকে আমি গ্রেফতার করছি। তোমার কাছে একটা লাইসেন্স ছাড়া অটোমেটিক রাইফেল, টাইপ ফ্যাবরিক। ন্যাশনাল, সিরিয়াল নাম্বার ফোর-ওয়ান সিক্স থ্রি-টু-ওয়ান-ফাইভ পাওয়া গেছে।

পাগল হয়ে গেছ! হেসে উঠলাম আমি।

ভুরু কুঁচকে দেখল আমাকে টালি, হাসিটা পছন্দ হয়নি তার। সাব-ইন্সপেক্টর এবং কনস্টেবলকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত দিল সে। ওদেরকে আগেই বলে রাখা হয়েছে, বিনাবাক্যব্যয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল ওরা। পরমুহূর্তে বাইরের লোহার বারটা আটকাবার শব্দ পেলাম।

কামরায় শুধু আমি আর টালি এখন। আমার কাছ থেকে ছয়। সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। বোতাম খোলা হোলস্টারে একটা হাত রেখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ইন্সপেক্টর টালি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় আজ। তার মানে অনেক বড় কোন মতলব আছে তার।

হিজ এক্সেলেন্সি এ-সব জানে, টালি? সহাস্যে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

হিজ এক্সেলেন্সি আজ বিকেল চারটেয় কমনওয়েলথ কনফারেন্সে যোগ দিতে লগুনে গেছেন। দুহস্তার আগে ফিরছেন না দ্বীপে।

নিজের অজান্তে হাসিটা নিভে ফেল মুখ থেকে। শুনেই বুঝলাম মিথ্যে কথা বলছে না টালি। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললাম, এবং তিনি চলে যাবার সাথে সাথে তোমার মনে হয়েছে দেশের নিরাপত্তা প্রচণ্ড ভ্রমকির সম্মুখীন হয়েছে, তাই না?

এবার হাসল টালি। হ্যাঁ। এবং সে হুমকি সৃষ্টি করছ তুমি, মাসুদ রানা। শোনো, আসল কথা পাড়ার আগে আমি বলতে চাই আজ আমাকে তুমি হালকাভাবে নিলে নিজের সর্বনাশ করবে। আমি সিরিয়াস, রিয়েলি সিরিয়াস।

তা আমি বুঝতে পেরেছি। দুটো হপ্তা এখানে তোমাকে আমি একা পাচ্ছি, মাসুদ রানা। দেয়ালগুলো মোটা এবং কোথাও একটু ফুটো বা ফাটল নেই-যত ইচ্ছা টেঁচাতে পারবে তুমি।

হাগল!

গালিটা গায়ে মাখল না টালি, বলল, দুটোর যে-কোন একটা পথ বেছে নিতে পার। হয় আমার সাথে আপোস করবে, নয়ত রামাদীন এসে তোমাকে মৃত ঘোষণা না করা পর্যন্ত পচবে।

ওই ঢ্যাঙা কবিরাজ আমার লাশ পরীক্ষা করবে? উঁহু, তার চেয়ে আমি বেঁচে থাকাই পছন্দ করব।

তোমাকে বলেছি, আমি সিরিয়াস, মাসুদ রানা! হুঙ্কার ছাড়ল টালি।

আঁতকে ওঠার ভান করে মাথাটা পিছন দিকে সরিয়ে নিলাম দ্রুত। তারপর হেসে বললাম, কি বিষয়ে আপোস করতে চাও? তোমার সাথে আমার ঝগড়াটা কিসের?

আমি জানতে চাই তোমার চার্টার পার্টি গোলাগুলি শুরু করার আগে ঠিক কোথায়-আই রিপোর্ট-ঠিক কোথায় ডাইভিং অপারেশন চালিয়েছিল।

বলিনি তোমাকে? বলেছি, তুমি ভুলে গেছ। রাসতাফা পয়েন্টের ওদিকে কোথাও। ঠিক কোথায় তা আমি নিজেই জানি না।

নির্দিষ্ট জায়গার বিন্দুটি পর্যন্ত জান তুমি, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে। বলল টালি। সুযোগটা হাতে পেয়ে হারাবার পাত্র তুমি নও। একথা তারাও জানত, সেজন্যেই তোমাকে তারা খুন করার চেষ্টা করেছে, একটু থেমে হাসল সে। আমি জানি সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। তাই ঠিক করেছি একটু ঝাঁকি

দেব তোমাকে। ঝাঁকিয়ে হয় প্রাণ নয় সত্য, দুটোর যে-কোন একটা বের করে। আনব তোমার ভেতর থেকে। নিঃশব্দে হাসছে সে এখন।

পাল্টা হেসে আমি তাকে বললাম, কাকে ভয় দেখাচ্ছ, টালি?

রাসতাফা পয়েন্টের প্রশ্নই ওঠে না-অসম্ভব! এখান থেকে উত্তর দিকে কাজ করছিল তোমরা মেইনল্যান্ডের দিকে। লর্ড নেলসনে তোমাকে আমি কি বলেছিলাম মনে আছে? বলেছিলাম, তোমার ওপর নজর রাখব। তোমার মুভমেন্ট সম্পর্কে কিছু। রিপোর্ট পেয়েছি আমি।

জায়গাটা রাসতাফা পয়েন্ট ছাড়িয়ে কোথাও, নির্লজ্জ ভাবে বললাম আবার।

বেশ, কাঁধ ঝাঁকাল টালি। দেখা যাক কতক্ষণ জেদ বজায় রাখতে পার। শুরু করার আগে শুধু একটা কথা বলতে চাই, অসহ্য যন্ত্রণায় যখন মুখ খুলতে বাধ্য হবে তখন মিথ্যে কথা বলে। আমাদের সময় নষ্ট কোরো না। মনে রেখ, সত্য-মিথ্যে পরীক্ষা করার জন্যে দুই হপ্তা সময় রয়েছে আমার হাতে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা। কি এক গোপন পুলকে ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে টালির। লোকমুখে শুনেছি, ও নাকি নিজেই বন্দীদের ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং তা উপভোগ করে। ওর মুখের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে দেখে বুঝলাম আমি একজন উন্মাদ স্যাডিস্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম কামরার চারদিকে।

না, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল টালি, কোনরকম চালাকি করলে গুলি খাবে।

আমার কাছ থেকে পনেরো ফুট দূরে ও। আমি নিরস্ত্র, দুর্বল। আমার পেছনে বন্ধ দরজা, তার ওপাশে দুজন সশস্ত্র পুলিশ। পেশী চিল করে দিলাম, কাঁধ দুটো একটু নেমে এল।

এই তো সুমতি হয়েছে, আবার বলল টালি। হাতকড়া পরিয়ে তোমাকে এখন সেলে ঢোকানো হবে, তারপর তোমার ওপর কাজ শুরু করব-যখন মনে করবে আর সহ্য করতে পারছ, তখন শুধু বললেই হবে, সাথে সাথে তোমার যাতে আরাম হয় সে ব্যবস্থা করব আমি। ছোট্ট একটা ইলেকট্রিকাল টরচার সেট ব্যবহার করব তোমার ওপর। মাত্র বারো ভোল্টের গাড়ির ব্যাটারির সাহায্যে চালাব। ইস্পাতের কাঁকড়াগুলো তোমার শরীরের কোন্ কোন্ জায়গায় বসাতে হবে তা আমিই বেছে নেব। সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে তা আমি আগেই বেছে রেখেছি... নিজের পেছন দিকে একটা হাত নিয়ে গিয়ে দেয়াল হাতড়াচ্ছে সে।

এই প্রথম লক্ষ করলাম দেয়ালে একটা ইলেকট্রিক বেলের বোতাম রয়েছে। বোতামে চাপ দিল টালি, বন্ধ দরজার বাইরে বেল বেজে উঠল, ক্ষীণ একটু আওয়াজ ঢুকল কানে।

ঘটাং করে লোহার বার নামিয়ে দরজা খুলে কামরার ভেতর ঢুকল পুলিশ দুজন।

এই লোক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যে একটা মারাত্মক ভ্রমকি, ওদেরকে বলল টালি। একে সেলের ভেতর নিয়ে যাও।

কিন্তু পুলিশ দুজন অর্ডার পেয়েও ইতস্তত করছে। আমাকে ওরা চেনে, তাই অভিযোগটার সত্যতা সম্পর্কে চিন্তা করছে।

সঙ সেজে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কুইক! ধমক মারল টালি।

দ্রুত আমার দুপাশে চলে এল পুলিশ দুজন। আমার আহত বাহুর ওপর হালকাভাবে একটা হাত রাখল টমসন। ভাল কাটা মৃদু ঝাঁকিয়ে টালি এবং তার পেছনের সেলের দিকে পা বাড়ালাম। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আশ সেকেণ্ডের একটা মাত্র সুযোগ চাই আমি।

তোমার মা কেমন আছে, টমসন? সরল আলাপের সুরে। জানতে চাইলাম।

ভাল আছেন, মিস্টার রানা, সসঙ্কোচে বিড়বিড় করে বলল টমসন। ইন্সপেক্টরের ব্যবহার দেখে তারই যেন মাথা কাটা। যাচ্ছে।

জন্মদিনে যে উপহারটা পাঠিয়েছিলাম সেটা পেয়েছেন? টমসনকে অন্যমনস্ক করে তুলতে চাইছি।
টালির পাশে চলে এসেছি আমরা, দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। শরীরের। পাশে ঝুলছে
রুলার ধরা ডান হাতটা।

হ্যাঁ, পেয়েছেন, মিস্টার রানা, বলল টমসন।

বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার শরীরে। ধাক্কা খেয়ে একপাশে সরে। গেল টমসন এবং টালি কিছু বুঝতে
পারার আগেই আমার একটা ভাঁজ করা হাঁটু ওর তলপেটের নিচে প্রচণ্ড গুতো মারল। নিখুঁত,
সুডৌল একটা গুতো-এর জন্যে যতবড় মূল্যই দিতে হোক আমাকে, তৃপ্তির তুলনায় তা নিতান্ত সস্তা
বলেই মনে হবে আমার।

মেঝে থেকে পা দুটো পুরোপুরি আঁঠারো ইঞ্চি শূন্যে উঠে গেল ইংরেজের, দরজা পেরিয়ে সেলগুলোর
লোহার রডে গিয়ে ধাক্কা খেল। তারপর পিঠ বাঁকা করে ঝুঁকে পড়ল নিজের পায়ের দিকে, দুহাত দিয়ে
চেপে আছে দুই উরুর সংযোগস্থল, চাপা। গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছে খোলা মুখ থেকে-কেটলির
ভেতর। পানি ফুটতে শুরু করলে এই ধরনের শব্দ হয়, ডিগবাজি খেয়ে। পড়ে যাচ্ছে দেখে এগিয়ে
গিয়ে আরেকটা হাঁটুর গুতো মারতে চাইলাম, কিন্তু পুলিশ দুজনের বিস্ময়ের ঘোর কেটেছে এতক্ষণে,
তারা আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে কামরার মাঝখানে টেনে আনল। এখন আর ওরা সম্মান
দেখাচ্ছে না, আমার আহত হাতটা ধরে মোচড় দিচ্ছে।

কাজটা খারাপ করলেন, মিস্টার রানা! রেগেমেগে চাঁচাচ্ছে। টমসন। আপনার কাছ থেকে এ-ধরনের
জঘন্য কাজ আশা করিনি আমি...

আহত হাতটা মুচড়ে ধরেছে টমসন, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করার চেষ্টা করছি। পাল্টা চিৎকার
করে বললাম, প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আমাকে অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছেন, টমসন! তুমিও তা জান!

সেলের সামনে বসে পড়েছে টালি। আহত জায়গাটা এখনও চেপে ধরে আছে হাত দিয়ে। যন্ত্রণায়
বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

এটা আমার বিরুদ্ধে একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র, টমসন। জানি, দ্রুত সময় বয়ে যাচ্ছে-টালি উঠে দাঁড়াবার শক্তি ফিরে পেলে পরিস্থিতি আমার বিপক্ষে চলে যাবে। ওর হুকুম অমান্য করার সাহস টমসন বা কনস্টেবলটার হবে না।

ওই সেলের ভেতর আমাকে ভরতে পারলে ও আমাকে খুন করবে, টমসন...

শাট আপ! চাঁচিয়ে উঠল টালি। উঠে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে আসছে এদিকে।

প্রেসিডেন্ট দেশে নেই বলেই...

শাট আপ! শাট আপ! মাথার ওপর রুলার তুলে আমার সামনে এসে পড়ল টালি।

শিশুর মত অসহায় বোধ করছি আমি। আত্মরক্ষার চেষ্টা করব সে-উপায় নেই আমার। বেকায়দাভাবে ধরে রেখেছে আমাকে ওরা। বেছে বেছে ক্ষতগুলোর উপর রুলারের বাড়ি মারছে টালি। প্রচণ্ড ব্যথায় মোচড় খাচ্ছে আমার শরীর। গলার ভেতর থেকে কাতর ধ্বনি বেরিয়ে আসছে। ওরা আমাকে ছাড়ছে না।

শাট আপ! ব্যথায় এবং ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেছে টালি। তাকে আমি খুন করব, বাস্টার্ড। রুলারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেল সে। হোলস্টার হাতড়ে পিস্তলটা ধরতে চাইছে।

এতক্ষণ যা আশা করছিলাম, এবার তা ঘটল। আমাকে ছেড়ে দিয়ে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল টমসন।

না! মাথা নেড়ে চাঁচিয়ে উঠল সে। ওটা হবে না। টালির দিকে ঝুঁকে পড়ে লম্বা কালো হাতটা দিয়ে টালির কজি চেপে ধরল।

সরো, সরো সামনে থেকে। আমি অর্ডার করছি, চিৎকার করে বলল টালি। কিন্তু হোলস্টার থেকে তার হাত সরিয়ে দিয়ে। পিস্তলটা বের করে নিল টমসন, পিছিয়ে এল।

এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে, টমসনকে শাসাচ্ছে টালি। তোমার ডিউটি..

আমার ডিউটি সম্পর্কে আমি সচেতন, ইন্সপেক্টর, শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল টমসন। বন্দীকে খুন হতে দেখা আমার ডিউটির। মধ্যে পড়ে না। এরপর আমার দিকে ফিরল সে। মিস্টার রানা, আপনার বোধহয় এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

একজন বন্দীকে পালাতে সাহায্য করছ, নিশ্চল আক্রোশে। দাঁতে দাঁত ঘষল টালি। এর মজাটা তোমাকে টের পাওয়াব আমি...

কোন ওয়ারেন্ট দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না, বাধা দিয়ে বলল টমসন। প্রেসিডেন্ট ফিরে এসে একটা ওয়ারেন্টে যদি সই করেন, তখন মিস্টার রানাকে খুঁজে নিয়ে আসা যাবে।

ব্যাটা কালো ভূত! হাঁপাচ্ছে টালি। বাস্টার্ড নিগার... আমার দিকে তাকাল টমসন। যান! বলল সে, পালান!

দশ

বাড়ি অনেক দূরের পথ, গাড়ির প্রতিটি ঝাকুনি বুকের ক্ষতটায় হাতুড়ির বাড়ি মারছে। আজ সন্ধ্যা রাতের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়ে গেছে আমার ধারণাই সত্যি, বিগ গাল আইল্যাণ্ডের পানিতে যে পোটলাটা ডুবিয়ে রেখে এসেছি সেটা সাংঘাতিক কিছু একটা না হয়েই যায় না। জিনিসটাকে কেন্দ্র করে আরও কি যে ঘটতে যাচ্ছে, কে জানে! ইন্সপেক্টর টালি সবশেষে যে কাজটা করতে যাচ্ছিল তার পেছনে আমাকে জেরা করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না তার-মরা মানুষকে জেরা করা যায় না। ভাবছি, টালি কি নিজে পরিচালিত হচ্ছে, নাকি তার সাথে আরও কেউ আছে?

বাগানের পাশে পিকআপ থামিয়ে নামলাম। বারান্দায় ওঠার সময় বুকের ব্যথায় কাতরে উঠলাম আবার। আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে বেগম রডরিক বাড়িটার দেখাশোনা করেছে। ডাইনিং রুমে চুকেই চোখ পড়ল টেবিলে, ফুলদানীতে তাজা ফুল। আইস-বক্সে পেলাম আরও প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো-ডিম, বীফ, ব্রেড এবং বাটার।

রক্ত ভেজা শার্ট এবং ড্রেসিং খুলে ফেললাম। বুকের ওপর রুলারের লম্বা দাগগুলো লাল হয়ে ফুটে উঠেছে। শাওয়ার সেরে নতুন করে ড্রেস করলাম ক্ষতগুলোয়, তারপর, কাপড়চোপড় পরার ঝামেলা এড়িয়ে স্টোভের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক প্যান ভর্তি ডিম আর বীফ চুলায় চড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত গাঢ় রঙের আধ গ্লাস হুইস্কিতে ওষুধ ঢেলে খেয়ে নিলাম চক চক করে।

বিছানায় শুয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজলাম। ভাবছি, এই শরীরে নির্দিষ্ট সময় নাইট ডিউটিতে যেতে পারব কিনা। পরদিন সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত এটাই ছিল আমার শেষ ভাবনা।

সকালে আবার শাওয়ার সেরে এবং এক গ্লাস ঠাণ্ডা পাইন। অ্যাপল জুস-এর সাথে দুটো পেইনকিলার ট্যাবলেট গিলে নিয়ে আরেক প্যান ভর্তি ডিম দিয়ে ব্রেকফাস্ট পর্ব সমাধা করলাম। ভাল ঘুম হয়েছে, ঝরঝরে লাগছে শরীরটা, সুতরাং প্রশ্নের জবাব মিলে গেছে। আরেকটা ছোট্ট ঘুম দিয়ে উঠে দুপুরে গাড়ি নিয়ে বেরুলাম। শহরে পৌঁছে থামলাম মা এডির দোকানে, গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে পৌঁছুলাম অ্যাডমিরালটিতে।

জেটির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে জলকুমারী। রডরিক আর ল্যাম্পনি পৌঁছে গেছে এরই মধ্যে।

একদ্বীপ ট্যাঙ্কগুলো ভরে নিয়েছি, মাসুদ, জানাল রডরিক। হাজার মাইলের থোরাক পেয়ে গেছে জলকুমারী।

কার্গো নেটগুলো বের করেছ?

বের করে মেইন সেইল লকারে রেখে দিয়েছি।

ডেক ভর্তি, উঁচু আইভরি কার্গো ঢাকার জন্যে নেটগুলো। ব্যবহার করব আমরা।

তোমার সেই পশমের কোটটা নিতে ভুলো না, বললাম ওকে। যা বাতাস দিচ্ছে খুব ঠাণ্ডা পড়বে সাগরে।

আমার কথা ছাড়, মাসুদ। নিজের দিকে একটু নজর দাও। দশদিন আগের মত খারাপ দেখাচ্ছে তোমাকে, ম্যান। তুমি। অসুস্থ?

সম্পূর্ণ সুস্থ, রডরিক।

হ্যাঁ, নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা বিদঘুটে আওয়াজ ছাড়ল রডরিক, ঠিক আমার শাস্ত্রীর মত।

একশো তিন বছর বয়স ওর শাস্ত্রীর।

তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করে জানতে চাইল, তোমার। কারবাইনটার খবর কি, ম্যান?

পুলিসের হেফাজতে রয়েছে।

তার মানে বলতে চাইছ ওটা ছাড়াই রওনা হব আমরা?

আজ পর্যন্ত ওটা কখনও কাজে লাগেনি আমাদের।

প্রথমবার বলে একটা কথা আছে, তাই না? প্রকাণ্ড মুখটা গম্ভীর করে তুলে বলল সে। ওটা না থাকলে নিজেকে আমার ন্যাংটো লাগবে।

আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে বিচিত্র কিছু ভ্রান্তি আছে রডরিকের, মনে পড়লেই হাসি পায় আমার। অনেকবার অনেকভাবে বোঝানো এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো সত্ত্বেও নিজের বিশ্বাস থেকে একচুল নড়াতে পারিনি ওকে আমি। ওর বিশ্বাস, একটা বুলেটের ভেলোসিটি এবং রেঞ্জ নির্ভর করে ড্রিগার টানার ওপর-সেটা যত জোরে টানা হবে ততই দ্রুতগতিতে এবং তত বেশি জোরে ছুটবে বুলেট। এবং ওর দৃঢ় বিশ্বাস, ওর ছোড়া বুলেট আর সবার চেয়ে দ্রুত বেশি দূরে যাবে।

গুলি করার সময় গায়ের এত বেশি জোর খাটায় ও যে এফএন কারবাইনের চেয়ে একটু হালকা যে-কোন রাইফেল ওর হাতে পড়লে সেটার বারোটা বেজে যাবে। শুধু তাই নয়, ঠিক গুলি করার মুহূর্তটিতে চোখ দুটো খোলা রাখাও ওর পক্ষে সম্ভব হয় না।

দশ ফুট দূর থেকে পনেরো ফুট লম্বা একটা টাইগার শার্ককে লক্ষ্য করে বিশ রাউণ্ডের পুরো একটা ম্যাগাজিন শেষ করতে দেখেছি ওকে আমি, একটা গুলিও লাগাতে পারিনি। তা না পারুক, তাই বলে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি ওর ভালবাসায় কোন ভাটা পড়েনি। আওয়াজ করে এমন যে-কোন ফায়ার আর্মসের দারুণ ভক্ত সে।

এটা একটা নির্বাক কাজ, রডরিক। মনে কর আমরা সমুদ্রবিহারে বেরিয়েছি।

কিন্তু আমার কথা ওর কানে গেছে বলে মনে হল না। ঘষে মেজে ইতিমধ্যে সোনার মত চকচক করে তোলা বোটের তামার যত কাজ আছে সেগুলো আরেকবার ব্যস্তভাবে পালিশ করতে শুরু করেছে ও। এখন ওকে বিরক্ত করলে রেগে যাবে, তাই কিছু না বলেই বোট থেকে নেমে এলাম আমি।

রামাদীনস ট্রাভেল এজেন্সির অফিসে ঢুকে দেখি কবিরাজী সেরে এইমাত্র ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরেছে চ্যাঙা লোকটা। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে নিঃশব্দে একটা চেয়ার দেখাল সে আমাকে। সেটায় বসলাম। ওর পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন? জানতে চাইলাম। আমি।

কার? পরমুহূর্তে বুঝতে পারল কার কথা বলছি। ও, . ইন্সপেক্টর টালির কথা বলছেন? হ্যাঁ।

কখন দেখা হয়েছে ওর সাথে আপনার? টালির মেজাজের। খবর জানতে চাই আমি।

আজ সকালে, মিস্টার রানা।

কেমন দেখলেন ওকে?

ভালই তো। কেন বলুন তো? ভুরু কুঁচকে চশমার ওপর। দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রামাদীন।

দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছেন? হাঁটাহাঁটি করছিল? গুনগুন করে কি গান গাইছিল? নাকি ঘেউ ঘেউ করছিল?

না তো! চোখ বড় বড় হয়ে উঠল রামাদীনের। এসব। করতে দেখিনি। তবে, খুব দুঃখিত বলে মনে হল। বেশি হাসেনি, বেশি কথা বলেনি। ব্যাপারটা কি, মিস্টার রানা?

দুঃখিত মনে হল বুঝি? হেসে উঠলাম আমি। সেটাই। স্বাভাবিক। ঘুষটা খেয়েছে তো?

দিতে না দিতেই-গপ করে, চোখ টিপে হাসল রামাদীন।

চুক্তি তাহলে বাতিল করেনি-গুড।

আপনার কথা শুনে একটু কৌতুহল হচ্ছে, হে হে...

এসব ব্যাপারে আপনার নাক গলাবার দরকার নেই, বললাম ওকে। প্রোগ্রামটা ব্যাখ্যা করুন তাড়াতাড়ি।

সালসা স্ট্রীমের মুখে, স্রোতটা যেখানে প্রধান দুজা মোহনার দক্ষিণ চ্যানেলে ঢুকছে, ওখান থেকে তুলে নিতে হবে কার্গো।

মাথা ঝাঁকিয়ে জানালাম, ঠিক আছে। চ্যানেলটা পরিচিত এবং ভাল।

রিকগনিশন সিগন্যাল হিসেবে থাকছে দুটো লর্সন-একটার ওপর আরেকটা, মুখের সবচেয়ে কাছের ঢালের মাথায় দেখা যাবে। দুবার আলো দেখাবেন আপনি, ত্রিশ সেকেন্ডের ব্যবধানে। তারপর নিচের লর্সনটা নিভে যেতে দেখবেন আপনিএরপর নোঙর ফেলবেন। ঠিক আছে সব?

কার্গো লোড করার জন্যে...

লাইটের থেকে লেবার দেয়া হবে।

ওরা জানে তো তিনটের দিকে পানি নামতে শুরু করবে, এবং তার আগেই চ্যানেল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের?

জানে, মিস্টার রানা, বলল রামাদীন। ওদেরকে বলে দিয়েছি দুটোর আগেই মাল তোলার কাজ শেষ করতে হবে।

এদিকটা তাহলে ঠিক আছে, বললাম ওকে। মাল খালাসের ব্যাপারটা বলুন এবার।

রাসতাফা পয়েন্টের পঁচিশ মাইল পূবে মাল খালাস করবেন আপনি, বলল রামাদীন।

চমৎকার! রাসতাফায় লাইট হাউজ আছে, আমার বিয়ারিঙ চেক করতে সুবিধে হবে। কিসে?

বড় একটা স্কুনারে। রিকগনিশন সিগন্যাল ওই একই-মাস্তুলে দুটো লর্সন। ত্রিশ সেকেন্ডের ব্যবধানে দুবার আলো দেখাতে হবে। তারপর দেখবেন নিচের লর্সনটা নিভে যাবে। এরপর আপনি মাল খালাস করবেন। এখানেও এরা লেবার দিয়ে সাহায্য করবে আপনাকে। ঠিক আছে সব?

শুধু টাকার ব্যাপারটা ছাড়া।

নিঃশব্দে পকেট থেকে একটা ভারী এনভেলাপ বের করে আমাকে দিল রামাদীন। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ধরে। সেটার গায়ে বল পয়েন্ট দিয়ে লেখা হিসেবটা দেখছি আমি।

বরাবরের মত অর্ধেক পেমেন্ট আছে ওখানে, বলল রামাদীন। বাকিটা ডেলিভারির সময় পাবেন।

সাড়ে তিন হাজার ডলার থেকে নিজের আর টালির কমিশন বাবদ একুশশো কেটে নিয়েছে রামাদীন। এনভেলাপে আছে চোদ্দশো, এ থেকে রডরিক আর ল্যাম্পনির বোনাস হিসেবে যাবে এক হাজার, আমার জন্যে থাকবে চারশো। বেশি নয়।

ঠিক আছে সব? আবার জানতে চাইল চ্যাঙা রামাদীন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আবার দেখা হবে।

.

শেষ বিকেলে বন্দর ত্যাগ করলাম আমরা। কুলি পিক থেকে। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে কেউ আমাদেরকে লক্ষ্য করতে পারে। ভেবে ধোকা দেবার জন্যে চ্যানেল ধরে মার্টিন পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম জলকুমারীকে, তারপর সন্ধ্যারাত্রে বোটের নাক ঘুরিয়ে নিলাম। ইনশোর চ্যানেল এবং দ্বীপমালার ভেতর দিয়ে এগোলাম দুজা নদীর মোহনার দিকে।

চাঁদ নেই আকাশে, কিন্তু তারাগুলো খুব উজ্জ্বল আর বড় হয়ে ফুটেছে, এবং চেউয়ের মাথার সাদা ফেনারশি ফসফরাসের মত জ্বলছে। দ্রুত গতিতে ছুটছে বোট, আমাকে পথ চিনতে সাহায্য। করছে কোথাও তারার আলো মাথা একটা প্রবাল দ্বীপ, কোথাও রীফের একটা ভাঙা পাঁচিল। পানির প্রবাহ এবং কলকল ছলছল শব্দের তারতম্য আমাকে চ্যানেলের ওপর দিয়ে নির্বিল্বে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে, সাবধান করে দিচ্ছে মগ্নচড়া এবং স্বল্প গভীরতার বিপদ থেকে।

ব্রিজে আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে শরীর জুড়ানো ঠাণ্ডা বাতাস, রডরিক আর ল্যাম্পনি। রেইল ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি আমরা। নিচে নেমে গিয়ে খানিক পর পর ধূমায়িত কালো কফি নিয়ে আসছে রডরিক। কাপে চুমুক দিচ্ছি আর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছি রাতের দিকে, দেখতে চেষ্টা করছি কোথাও স্নান। আলো ঝিক করে ওঠে কিনা। পানিতে তারার আলোর লম্বা আঁচড় আর একটা পেট্রল বোটের গায়ে সেই আলোর প্রতিবিম্ব আনাড়ি লোকের দৃষ্টিতে একই রকম মনে হতে পারে, কিন্তু পার্থক্যটা দেখামাত্র ধরা পড়বে আমাদের চোখে।

একবার শুধু নিস্তব্ধতা ভাঙল রডরিক। টমসন বলছিল দুর্গে নাকি গোলমাল হয়েছে তোমার সাথে, মাসুদ?

সামান্য।

পরে টমসন ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।

টমসনের চাকুরি আছে এখনও?

কোনমতে ঝুলছে। টালি ওকে সেলে ভরতে চায়, কিন্তু অসুবিধে হল টমসনের গায়ে ওর চেয়ে বেশি জোর।

আলোচনায় যোগ দিল ল্যাম্পনি। লাঞ্চার সময় স্কুল বইয়ের একটা চালান এসেছে কিনা দেখার জন্যে এয়ারপোর্টে গিয়েছিল জুডিথ, মেইনল্যান্ডগামী একটা প্লেনে চড়তে দেখেছে তাকে ও।

কাকে? ভুরু কুঁচকে উঠল আমার।

ইন্সপেক্টর টালিকে।

আগে কেন বলনি আমাকে?

ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি, বস্।

না, একমত হয়ে বললাম, গুরুত্বপূর্ণ হয়ত নয় ব্যাপারটা।

অমন একশো একটা কারণে মেইনল্যাণ্ডে যেতে পারে টালি, আমার তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।
তবু কেন যেন খুঁত খুঁত করতে শুরু করল মনটা। যখন একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমি, ঠিক তখন
আমার একজন শত্রু অজ্ঞাতস্থানের দিকে রওনা দেবে ব্যাপারটা ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছি
না।

কারবাইনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, ম্যান, বলল রডরিক।

আমিও ভাবছি, ওটা সাথে থাকলে ভাল হত। কিন্তু কোন মন্তব্য করলাম না।

দুজার দক্ষিণ চ্যানেল-এর প্রবেশপথে সাধারণত যে ব্যাপক আলোড়ন দেখা যায় জোয়ারের তীব্র
স্রোতের তোড় তা দাবিয়ে সমান করে দিয়েছে। অন্ধকারে অন্ধের মত খুঁজছি সেটাকে। আমরা।
দুপাশের মাটির ঢালের কিনারায় আদিবাসী নিগ্রো জেলেরা মাছ ধরার ফাঁদ পেতে রেখেছে সারি
সারি, শেষ পর্যন্ত এই ফাঁদগুলোই সাহায্য করল প্রবেশপথটাকে খুঁজে বের করতে।

চিনতে ভুল করিনি বুঝতে পেরে দুটো ইঞ্জিন অফ করে দিলাম আমি। জোয়ারের গায়ে চড়ে নিঃশব্দে
এগোচ্ছে জলকুমারী। তিন জোড়া সজাগ কান গভীর ধ্যানমগ্নতার সাথে শুনতে চেষ্টা করছে পেট্রল
বোটের ক্ষীণতম স্পন্দন। কিন্তু রাতজাগা হিরণ পাখির চিৎকার আর অল্প পানিতে মুলিট মাছের
লেজ ঝাঁপটানর শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমরা।

ভূতের মত নিঃশব্দে চ্যানেলের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে জলকুমারী। দুপাশে দৈত্যের মত ম্যানগ্রোভ
গাছের কালো ছায়া। অন্ধকার পানিতে তারার আলো টুকরো টুকরো হয়ে নাচানাচি করছে।
অকস্মাৎ বোটের গা ঘঁষে দ্রুত চলে গেল লম্বা, সরু একটা জেলে নৌকো। দুজন জেলের সাথে
নিমেষের জন্যে। চোখাচোখি হল আমাদের, মুখ থেকে ফিরছে ওরা। আমাদেরকে দেখে একটু থামল,
কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী হাঁক ছেড়ে কুশলাদি। জানতে না চেয়েই কেটে পড়ল দ্রুত।

লক্ষণটা ভাল নয়, বলল ল্যাম্পনি।

কিন্তু উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু নয়, বললাম ওকে। নিজেদের আস্তানায় ফিরে যেতে অনেক সময় লাগবে ওদের। বিশ্রাম নেবার পর মনমেজাজ যদি ভাল থাকে তবেই খবরটা কাউকে দেবার জন্যে রওনা হবে। সঠিক লোক খুঁজে বের করতে হবে ওদেরকে, যে খবরটা পৌঁছে দেবে উপকূল রক্ষীদের কানে। তারা যদি খবরটা বিশ্বাস করে...ততক্ষণে লর্ড নেলসনে ফিরে গিয়ে বিয়ার খাচ্ছি আমরা। তাছাড়া, জানি আমি, এই উপকূলের প্রায় সমস্ত জেলেই কোন না কোন অবৈধ তৎপরতার সাথে জড়িত-কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করার ঝুঁকি কেউ নেবে না।

সামনে তাকিয়ে দেখি প্রথম বাঁকটা এগিয়ে আসছে। স্রোতের ধাক্কায় জলকুমারী ওপাশের তীরের দিকে সরে যেতে শুরু করেছে। স্টার্টার বাটন অন করে ইঞ্জিন দুটো চালু করলাম আবার, গভীর পানিতে ফিরিয়ে আনছি বোট।

সর্পিল চ্যানেল ধরে একেবেঁকে এগোচ্ছি। অবশেষে প্রশস্ত পানির ওপর বেরিয়ে এলাম। দুপাশে এখন ম্যানগ্রোভের ছায়া দেখা যাচ্ছে না, ক্রমশ নগ্ন, শক্ত মাটির ঢাল উঠে গেছে ওপর দিকে। মাইলখানেক দূরে, ঢালের মাঝখানে গভীর একটা ফাটলের মত, সালসা নদী তার এক শাখার সাথে মিলিত হয়েছে ওখানে। উঁচু ঝোপের ঝাকড়া মাথাগুলো প্রায় আড়াল করে রেখেছে জায়গাটা। আরও পেছনে জোড়া লণ্ঠনের নরম হলুদ আলো দেখা যাচ্ছে, একটার ওপর আরেকটা।

বলিনি, রডরিক, এটা একটা নির্ঝঞ্ঝাট কাজ?

এখনও আমরা গ্র্যাণ্ড হারবারে ফিরিনি, ম্যান, বলল সে গভীর কণ্ঠে।

বোতে চলে যাও, ল্যাম্পনি। কখন নোঙর ফেলতে হবে বলব তোমাকে আমি।

থ্রি, ফোর, নক অ্যাট দ্য ডোর, ছড়াটা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার, ফাইভ, সিক্স, পিক আপ দ্য স্টিকস। ভুইল লক করে রেইলের নিচের লকার খুলে হ্যাণ্ড স্পটলাইটটা বের করলাম। একটা অপরাধ বোধ ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ সেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল আমার ভেতর। যত যুক্তিই দাড় করাই না কেন, আজকের এই নাইট ডিউটিতে আসার পেছনে আসলে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই।

ইনফরমেশন পাবার জন্যে নাইট ডিউটি করা আলাদা কথা, আর স্বেচ্ছা নগদ নারায়ণের লোভে এ-পথে পা বাড়ানো মারাত্মক অন্যায়। এমন কি, ফিরে যেতেও ইচ্ছা হল একবার। কিন্তু এত কাছে চলে এসে ফিরে যাওয়া যায় না। তাতে সংশ্লিষ্টদের মনে শুধু সন্দেহই জাগিয়ে তোলা হবে। তাছাড়া, ফিরে গেলে খাব কি? ক্রুদের বেতন দেব কোথেকে? ফুয়েলের বিল কে দেবে? কে। দেবে মা এডির পাওনা টাকা? আর অর্থ-পিশাচ চ্যাঙা। রামাদীনকেই বা কি বলব? না, ফিরে যাওয়া যায় না। স্পটলাইটটা মুখের সামনে তুলে তাক করে ধরলাম উজানের। জ্বলন্ত জোড়া লণ্ঠনের দিকে।

দুবার নয়, ত্রিশ সেকেণ্ড পর পর তিনবার সিগন্যাল দিলাম। আমি। কিন্তু লণ্ঠন জোড়ার সাথে সমান্তরাল রেখায় বোট না। পৌছানো পর্যন্ত নিচের বাতিটা নিভল না।

নোঙর ফেল, ল্যাম্পনি, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বললাম।

ভারী হুকটা ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে। দ্রুত, ঘড় ঘড় শব্দ। করে নেমে যাচ্ছে চেইনটা। মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে নোঙরের টানে ঘুরে যাচ্ছে জলকুমারী। যে-পথে এসেছি সেদিকে মুখ করে স্থির হল সে।

নিঃসঙ্গ রাত। শব্দ নেই কোথাও। নেটগুলো বের করার জন্যে। কেবিনে গিয়ে ঢুকল রডরিক। রেইলের কাছে দাঁড়িয়ে আছি আমি, পানির ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে সিগন্যাল বাতিটার দিকে। সালসা নদীর ঝোপ-ঝাড় ঢাকা ঢালে ব্যাঙ ডাকছে, তাছাড়া। কোথাও আর কোন শব্দ নেই।

এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে কিছু একটা শুনতে পাচ্ছি। শোনার চেয়ে বোধহয় অনুভব করলাম বলাই ভাল। ঠিক কান দিয়ে নয়, বরং পায়ের জুতোর সোল-এর মধ্যে দিয়ে শব্দটা বা কম্পনটা। টের পেলাম। প্রকাণ্ড এক দানবের হুংকম্পনের মত।

এক সেকেণ্ড পর নিঃসন্দেহে বুঝলাম একটা অ্যালিসন মোরন ডিজেল ইঞ্জিনের অলস শব্দ ওটা। জিনবালা ক্রাশবোটে এই ইঞ্জিনই ব্যবহার করছে ওরা।

ল্যাম্পনি! সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে চাপা কণ্ঠে দ্রুত বললাম। চেইন ফেল! কুইক, ফর গডস সেক, কুইক!

ঠিক এই ধরনের বিপদের জন্যে চেইনে একটা শ্যাকল পিন আটকে রেখেছি আমরা। ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার সময় শুনতে পাচ্ছি পিনটা বের করার জন্যে চার পাউণ্ড ওজনের হ্যামার ঠুকছে ল্যাম্পনি। তিনবার হ্যামার ঠুকল সে, শুনতে পেলাম চেইনের শেষ প্রান্ত বোট থেকে আছাড় খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল সেটা।

নেমে গেছে, বস!

থ্রটল খুলে দিয়েছি আমি। রাগে গরগর করছে জলকুমারী, সাদা ফেনা তুলে লাফ দিল সামনের দিকে। ভাটির দিকে মুখ করে আছি আমরা, কিন্তু বোটের মুখে চাপ দিয়ে রেখেছে ফাইভ নটের তীব্র স্রোত, তাই লাফটা তেমন জোরাল এবং দ্রুত হল না।

আমাদের ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়েও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি অ্যালিসনের স্পষ্ট আওয়াজ। ঝোপে ঢাকা সালসা নদীর মুখের কাছে লম্বা একটা বোটের কাঠামো ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। তারার ল্লান আলোতেও ওটার চওড়া বো চিনতে পারছি।

কোমরটা চিকন, গ্রে-হাউপের মত, পিছনটা চারকোনা বাক্সের মত। এটা একটা রয়্যাল নেভির ক্রাশবোট, যৌবনকালটা কেটেছে ইংলিশ চ্যানেলে, আর শেষ বয়সে এই অভিশপ্ত উপকূলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এক লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রতিযোগিতায় নামলে সাহসের সাথে পাল্লা দেবে জলকুমারী, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কিছুই করার উপায় নেই তার। দ্রুত গতি এবং সবটুকু শক্তি নিয়ে চ্যানেলে ঢুকে পড়েছে তার প্রতিপক্ষ, ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে পথরোধ করে ফেলছে। বোটটার ব্যাটল লাইটের আলো কঠিন একটা পদার্থের মত ধাক্কা মারল আমাদেরকে। দুটো উজ্জ্বল আলোর মোটাতাজা বীম চোখ ধাধিয়ে দিল। নিজের অজান্তেই হাত দুটো উঠে গেল কপালের কাছে।

চ্যানেল জুড়ে একেবারে সামনে চলে এসেছে বোটটা। ফোরডেকে উঁচু মঞ্চে বসানো থ্রি পাউণ্ডার কামানটাকে ঘিরে কয়েকটা ছায়ামূর্তি দ্রুত ঘোরাফেরা করছে। কামানের মাজলটা ঠিক যেন আমার নাকের বাঁ দিকের ফুটোয় তাকিয়ে আছে সরাসরি। স্ফোভ এবং হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা।

নিখুঁত একটা অ্যামবুশ, সন্দেহ নেই। মরিয়া হয়ে ভাবলাম, দেব নাকি একটা ধাক্কা? প্লাই উডের শরীর ওটার, সম্ভবত পচন ধরেছে এখানে সেখানে, জলকুমারীর ফাইবার গ্লাসের বো ধাক্কাটা হয়ত

সামলে নিতে পারবে। কিন্তু মুশকিল হল জলকুমারীর গতি বড় মন্থর এখনও, স্রোত ঠেলে তেমন এগোতে পারছে না সে।

এই সময় বিদ্যুৎ চালিত একটা বুলহর্নের যান্ত্রিক শব্দ পেলাম। চোখ ধাধানো ব্যাটল লাইটের পিছনের অন্ধকারে। দাঁড়িয়ে কেউ একজন হুকুম করছে।

ইঞ্জিন বন্ধ করুন, মি. রানা। তা নাহলে কামান দাগতে বাধ্য। হব।

জলকুমারীর সলিল সমাধির জন্যে থ্রি-পাউণ্ডারের একটা। শেলই যথেষ্ট। এত কাছ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে একটা। অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করবে ওরা তাকে। শ্রাগ করলাম, তারপর অফ করে দিলাম ইঞ্জিন।

বুদ্ধিমানের কাজ করলেন, মি. রানা, বুলহর্ন থেকে প্রশংসা করা হল আমার, এবার দয়া করে যেখানে আছেন সেখানেই। নোঙর ফেলুন।

তাই কর, ল্যাম্পনি!

আমার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে অতিরিক্ত নোঙরটা পানিতে ফেলল ল্যাম্পনি। অকস্মাৎ আবার আহত হাতটায় তীব্র হয়ে। উঠল ব্যথা, গত কয়েক ঘন্টা ধরে ভুলেই ছিলাম ওটার কথা।

হায় কারবাইন! আমার পাশ থেকে বিড়বিড় করে উঠল রডরিক।

বাজে বকো না! ধমকে উঠলাম আমি। ওই কামানের মুখে কি কাজে আসত কারবাইন?

আনাড়ি ভঙ্গিতে জলকুমারীর পাশে এসে ভিড়ল ক্রাশবোট। কামান এবং আলো এখনও আমাদের দিকে মুখ করে আছে। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। বিদায় জলকুমারী, মনে মনে বললাম আমি। আজ দুজনের দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেল বেঁকে!

আমার ভাবনার মধ্যে ঠাট্টার ভাব থাকলেও বোটটা হারাতে যাচ্ছি ভেবে হতাশায় একেবারে মুষড়ে পড়লাম। জলকুমারী আছে, তাই সবার কাছে আমি মিষ্টার রানা। ওটা যখন থাকবে না তখন আমি দ্বীপের আর দশজন মানুষের মত একজন হয়ে যাব। আমার নির্বাসিত জীবনের সমস্ত দুঃখ আর অভিমান ভুলিয়ে রেখেছে জলকুমারী। ওকে হারালে আমার আর থাকবে কি? তার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

ক্রাশবোটের রেইল নামিয়ে ফেলা হল। ছয়জন সশস্ত্র লোক লাফ দিয়ে চলে এল জলকুমারীর ডেকে।

মাদারলেস বাস্টার্ডস্! পাইকারিভাবে ওদের নাম রাখল রডরিক।

নিজেদের মধ্যে অনর্গল কথা বলছে ওরা। সবার পরনে নীল রঙের ইউনিফর্ম। হাতে লম্বা এ-কে পয়েন্ট ফরটিসেভেন অটোমেটিক রাইফেল। আমাদেরকে কিল ঘুসি এবং রাইফেলের কুঁদো দিয়ে গুঁতো মারার সুযোগ খোঁজার জন্যে হুড়োহুড়ি শুরু করেছে ওরা। ঠেলা মেরে সেলুনে ঢোকাল তিনজনকে, কাঁধে রাইফেলের বাড়ি মেরে ফরওয়ার্ড বাল্কহেডের গায়ে লাগানো বেঞ্চ বসিয়ে দিল। দুজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে সামনে, আমাদের নাকের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে দেখতে পাচ্ছি সাবমেশিনগানের ব্যারেল।

শালা বস্! বোনাসের পাঁচশো ডলার কেন দাও আজ তা। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি! আমাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে রসিকতার আশ্রয় নিল ল্যাম্পনি। কিন্তু হুঙ্কার ছেড়ে অটোমেটিকের বাঁট দিয়ে ওর মুখে প্রচণ্ড একটা ঘা মারল একজন গার্ড। ঠোঁটের কোণে বেরিয়ে আসা রক্ত মুছে আড়চোখে আমার দিকে তাকাল ল্যাম্পনি। ওর হাতে চাপ দিয়ে ওকে আমি সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু এরপর আমরা কেউ আর কোন রসিকতা করার চেষ্টা করলাম না।

অন্যান্য সশস্ত্র লোকেরা জলকুমারীকে নির্দয়ভাবে ভেঙেচুরে। ফেলছে। ভাবলাম কিছু হয়ত খুঁজছে ওরা। একটু পর বুঝলাম খুঁজছে বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু নয়। খোলা লকার ভাঙল ওরা, কুঠারের ঘা মেরে প্যানেলিঙে গর্ত করল। একজন আবিষ্কার করল পানীয় রাখার কেবিনেটটা। মাত্র একটা কি দুটো মদের বোতল পেয়েই আনন্দ-উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। কে কার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে

এক ঢোক গিলবে তারই প্রতিযোগিতা বাধিয়ে দিল। যতটা না পেটে গেল তার চেয়ে বেশি শুষ্ক নিল ওদের কাপড়-চোপড়। তারপর ওরা লুট করতে গেল ফুড স্টোরগুলো।

চারজন ক্রুকে সাথে নিয়ে ছয় ইঞ্চি দূরত্ব পেরিয়ে ক্রাশবোট। থেকে জলকুমারীতে এল এরপর একজন কমান্ডিং অফিসার। অন্যান্যরা তখনও কাঁচ আর কাঠ ভাঙছে, চাঁচামেচি করছে আর গলা ছেড়ে হাসছে।

জলকুমারী একটু দুলছে, পায়ের ভারী আওয়াজের সাথে একটা কম্পন অনুভব করছি আমরা। ভুরু কুঁচকে রডরিকের। দিকে তাকালাম আমি। তার চেহারাতেও বিস্ময় ফুটে উঠেছে। কার পায়ের আওয়াজ এটা? কে সে, যার পায়ের চাপে দুলে ওঠে জলকুমারী?

সেলুনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। পরমুহুর্তে বুঝলাম, না, বন্ধ হয়নি। বিশাল একটা শরীর এইমাত্র হাজির হয়েছে ওখানে, সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে প্রবেশ পথটা। ক্রাশবোটের কমান্ডার একটু দম নেবার ফাঁকে সম্ভবত ভেতরে প্রবেশ করার কৌশল সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করছে।

এগারো

সম্ভবত সাত ফুটের বেশি লম্বা লোকটা, পেটটা প্রকাণ্ড একটা ড্রামের মত। দুই কাঁধে ছমাসের দুই শিশুকে শুইয়ে দিলে হাত পা ছুঁড়ে খেলবে তারা, পড়ে যাবার কোন ভয় নেই। প্রকাণ্ডদেহী রডরিককে ওর সামনে ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। কমাণ্ডিং অফিসার ব্যঙ্গ মেশানো কৌতুক এবং তাচ্ছিল্যের সাথে ওকে দেখল একবার। আপনা থেকেই মাথা হেঁট হয়ে গেল রডরিকের, বিনা বাক্যে অফিসারের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিল ও।

সাদা ইউনিফর্ম জ্যাকেট পরে আছে লোকটা। পিরিচের মত বড় বড় বোতাম রয়েছে তাতে, দীর্ঘদিন ব্যবহার করায় বোতামগুলোর চারপাশে কালচে দাগ ফুটেছে, বগলের কাছ থেকে বেশ কিছু অংশ সম্পূর্ণ ভিজে গেছে ঘামে। বুকের ওপর স্টার আর মেডেলের ব্যাপক সমারোহ দেখতে পাচ্ছি। ভিড়ের মধ্যে আমেরিকান ন্যাভাল ক্রস আর ভিকট্রি স্টার, এই দুটো চিনতে পারলাম। পঞ্চাশজন মেহমানের রান্না চড়বে এতবড় একটা তামার ডেকচির মত মাথা লোকটার, পালিশ করা কালো লোহার মত রঙ সেটার। তাতে এটে বসে আছে একটা ন্যাভাল ক্যাপ, সোনালি ফিতে দিয়ে কিনারা মোড়া। চকচকে ঘামের নদী বয়ে যাচ্ছে তার মুখে। বাটারফ্লাই রঙের একটা তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে সে, আর দুগ্ধবতী গরুর মত শব্দ করে বাতাস ছাড়ছে নাক দিয়ে।

ধীরে ধীরে শরীরটা তার আরও ফুলে উঠতে শুরু করল বিশাল একটা ব্যাণ্ডের মত-ফেটে যাবে সেই ভয়ে সতর্ক হয়ে উঠলাম আমি। কালচে-গোলাপী রঙের ট্রাক্টর টায়ারের মত মোটা। ঠোঁটের জোড়া ফাঁক হয়ে গেল, এবং উজ্জ্বল বেগুনি রঙের মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর জোরাল একটা আওয়াজ।

শাট আপ!

নিমেষে পাথর হয়ে গেল কুরা, এবং পিনপতন নিস্তব্ধতা নামল। বিশাল একটা পাহাড় হেঁটে চলে এল সেলুনের ভিতর, আমার দিকে তাকাল সে এবং ধীরে ধীরে তার মুখে ফুটে উঠল। বন্ধুসুলভ উজ্জ্বল হাসি। চোখ দুটো কালো চামড়ার পুরু ভাজের ভেতর প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে।

মি. রানা, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না আজ আমি কত খুশি, কণ্ঠস্বরটা গম্ভীর, সুরটা প্রতিমাখা, পরিশীলিত ব্রিটিশ উচ্চারণ-ওর ইংরেজি আমার চেয়ে ভাল। কবে আপনার সাথে। পরিচয় হবে এই আশায় অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করছি। আমি ভাগ্যবান, আজ আমার আশা পূর্ণ হল।

ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল, বললাম তাকে ওই ইউনিফর্ম আর পদক দেখে আন্দাজ করেছি অ্যাডমিরালের চেয়ে নিচের র‍্যাঙ্ক হতে পারে না এই লোকের।

অ্যাডমিরাল! আনন্দে উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ। চমৎকার, কানে যেন মধুবর্ষণ করল। কিন্তু, মি. রানা, আমি। একজন স্নেহ সাদামাঠা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার।

এ অন্যায়। তার মানে আপনার সাথে বৈষম্য করা হয়েছে।

পদে কিছু এসে যায় না, তোয়ালে দিয়ে প্রকাণ্ড মুখ থেকে ঘাম মোছার জন্যে বিরতি নিল সে। কর্তৃত্বের কোন অভাব নেই আমার। মি. রানা, আমি একজন ক্ষমতাবান পুরুষ-বিশ্বাস করুন, জীবন এবং মৃত্যু আমার মুঠোয় ধরা আছে। তবে বিশেষ প্রয়োজন না হলে এই ভয়ানক শক্তিটা আমি ব্যবহার করি না।

বিশ্বাস করি, কমান্ডার, কণ্ঠে ব্যগ্রতা এনে বললাম। দয়া করে আমাদের ওপর আপনার ওই শক্তিটা ব্যবহার করবেন না দোহাই লাগে।

হো হো বা হা হা নয়, তার অউহাসির শব্দটা হো হা শোনাচ্ছে, অদ্ভুত ছন্দবিরতির সাথে দমকা বাতাস বেরিয়ে আসছে তার মুখের ভেতর থেকে। বিলিভ মি, আপনাকে আমার দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। রসিকতা পছন্দ করি আমি। ফর গডস সেক, বোঝা যাচ্ছে, আপনি আর আমি খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারব।

আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে এ ব্যাপারে, কিন্তু আমি তা প্রকাশ করলাম না।

আমার বদান্যতার একটুকরো নমুনা হিসেবে আমি প্রস্তাব করছি, সহাস্যে বলল কমাণ্ডার, আপনি আমাকে আমার নাম ধরে সম্বোধন করবেন। প্রসঙ্গক্রমে জানাচ্ছি, এই নাম শুনলে বাঘেমোষে এক সাথে পানি খায়...

এবং সবার বুক কেঁপে ওঠে, ফস করে বলল রডরিক, ভয়ে।

একেবারে খাঁটি কথা, কমাণ্ডার প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল রডরিকের দিকে। তোমার সাইজ দেখে মনে হচ্ছে আমার পূর্বপুরুষদের কারও সাথে তোমার দাদী বা নানীর পরিচয় ছিল। সে যাক, আমার দিকে তাকাল সে। আমাকে আপনি হুমায়ুন দাদা বলে ডাকবেন।

ধন্যবাদ, হুমায়ুন দাদা, বললাম। আমি মাসুদ রানা।

অ্যাঁই, কে আছ, এক ড্রাম ওয়াইন নিয়ে এস! হুঙ্কার ছাড়ল হুমায়ুন দাদা। এক পা পিছিয়ে গিয়ে চামড়া মোড়া প্রকাণ্ড সিটে বসল সে। সেটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে মনে করে ভীত হয়ে উঠলাম আমি।

এই সময় আরেকজন লোক ঢুকল সেলুনে। পরনে পুলিশ ইউনিফর্মের পরিবর্তে লাইট ওয়েট সিল্ক সুট এবং লেবু রঙা সিল্ক শার্ট, তার সাথে মানানসই টাই এবং পায়ে গো-সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো। হালকা সোনালি চুলগুলো পরিপাটি করে ব্যাকব্রাশ করা, গোঁফটা সুন্দর করে ছাঁটা। কিন্তু হাঁটার ভঙ্গিতে একটা আড়ষ্ট ভাব রয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলাম। আমি।

নরম সুরে জানতে চাইলাম, তোমার বল ব্যাগটার কি অবস্থা এখন, টালি?

উত্তর না দিয়ে হুমায়ুন দাদার পাশের সিটে বসল টালি। হুমায়ুন দাদা তার আরেক পাশের সিটটা দেখিয়ে আমাকে বলল, আমার পাশে এসে বসো, ফ্রেণ্ড।

একটু পর তিন বোতল হুইস্কি এল আমাদের সামনের টেবিলে। দেখেই বুঝলাম আমাদের স্টোররুম থেকে বাক্স ভেঙে নিয়ে আসা হয়েছে। যাই হোক, তিনটে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল হুমায়ুন দাদা, আমাকে এবং টালিকে একটা করে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা শূন্য তুলে উদাত্ত গলায় বলল, স্থায়ী বন্ধুত্ব

এবং পারস্পরিক সমৃদ্ধি কামনা করে... আমার গ্লাসের সাথে নিজেরটা। ঠুকে নিল সে, তারপর এক চুমুকে শেষ করল সেটা।

আমি আর টালি সাবধানে গলা ভেজাচ্ছি, আর মনের আনন্দে ঢক ঢক করে গিলেই চলেছে দাদা। একসময় তার মাথাটা পিছন দিকে হেলান দিল এবং বুজে এল চোখ দুটো। এই সুযোগটা গ্রহণ করতে চাইল ক্রুদের একজন। এক পা সামনে এগিয়ে। টেবিলের ওপর থেকে তার বোতলটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে।

বিদ্যুৎ বেগে নড়ে উঠতে দেখলাম হুমায়ুন দাদার বিশাল কালো একটা হাতকে। উল্টো পিঠ দিয়ে লোকটার কপালে মারল সে। স্যাং করে মাথাটা পেছন দিকে সরে গেল তার, ছিটকে গিয়ে পড়ল শরীরটা সেলুনের দেয়ালে, সেখান থেকে হাঁটু ভেঙে নেমে এল মেঝের ওপর। মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়ছে সে, সম্ভবত। অন্ধকার দেখছে চোখে।

টের পেলাম শরীরে মেদের বিপুল সমাবেশ সত্ত্বেও অসুরের শক্তি রয়েছে হুমায়ুন দাদার গায়ে। ঢুলু ঢুলু চোখে আমার দিকে তাকাল সে। মুখের চামড়া ভাঁজ খেয়ে প্রায় উল্টে যাচ্ছে দেখে বুঝতে পারলাম হাসছে সে। বলল, রানা, যতদূর জানি, ইন্সপেক্টর টালির সাথে একটা ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনার সময় তোমাদেরকে বাধা দেয়া হয়, যার ফলে সেটা পণ্ড হয়ে যায়।

সেই আলোচনাটা এখন শুরু করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এখানে আমাদেরকে বাধা দেবার মত কেউ নেই।

নিঃশব্দে শ্রাগ করলাম।

এখানে আমরা সবাই যুক্তিবাদী মানুষ, সে-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই, বলল হুমায়ুন দাদা।

কোন মন্তব্য না করে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছি হাতে ধরা গ্লাসের হুইস্কির দিকে।

নিজের পজিশনটা বোঝার চেষ্টা কর, রানা, পণ্ডিত মশায়ের মত জ্ঞানদান করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে হুমায়ুন দাদা। মুখভর্তি হুইস্কি নিয়ে সেটা পেটে চালান করার আগে শব্দ করে কুলি করল। এই অবস্থায় যদি কথা না শোনো তোমার পরিণতি কি হতে পারে, এসো, কল্পনা করে দেখা যাক।

ভিজে সপসপে তোয়ালেটা নিঙড়ে দিল একজন ক্রু। সেটা দিয়ে আবার ঘাম মুছল হুমায়ুন দাদা। সবচেয়ে আগে, একজন বেয়াদপ লোকের শাস্তি হতে পারে, অমায়িক হেসে বলল সে, একজন একজন করে তার কুকে বাইরে নিয়ে গিয়ে কতল করা। ভাল কথা, এ ধরনের কাজে এদিকে আমরা কাঠ ফাড়ার কুঠার ব্যবহার করি, তা তোমার জানা আছে?

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম।

অবশ্য ইন্সপেক্টর টালি আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে কাউকে কতল করার দরকার হবে না। তোমার মনটা নাকি ডিমের কুসুমের মত নরম, ক্রুদেরকে নিজের চোখের দুটো মণির মত ভালবাস, ঠোঁট ওল্টাল সে। সত্যি মিথ্যে তুমিই জানো।

রডরিক আর ল্যাম্পনি অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল।

তারপর ধর, খোশ আলাপের সুরে বলে চলেছে হুমায়ুন দাদা, তোমার সাধের জলকুমারীকে জিনবালা বে-তে নিয়ে যাওয়া হবে। তার মানে, ইহজীবনে ওটার আর চেহারা দেখতে পাবে না তুমি। সংশ্লিষ্ট সরকার ওটাকে বাজেয়াপ্ত করবেন। তারপর ধর, নিজেকে তুমি আবিষ্কার করবে জিনবালা জেলে।

জিনবালা কারাগারটাকে সিংহের খাঁচা বলা হয়। সবাই জানে। ওখান থেকে মাত্র দুভাবে ছাড়া পায় বন্দীরা। এক, মৃত অবস্থায়। দুই, পঙ্গু অবস্থায়। হুমায়ুন দাদা, মৃদু কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বললাম, আপনার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই।

তা আমি জানি, হো হা করে হাসল সে। তাহলে আর দেরি না করে ভাটার আগেই যদি রওনা দিই মাঝরাতের কাছাকাছি। সময়ে ইনশোর চ্যানেল থেকে বেরিয়ে যেতে পারব, কি বল?

তা পারব।

তারপর তুমি আমাদেরকে নিয়ে যাবে সেই জায়গায়, যেখানে। তোমার চার্টার পার্টিরা ডাইভ দিয়েছিল, কি বল?

অবশ্যই।

ওখানে পৌঁছে জায়গাটা আমরা পরীক্ষা করব। যখন বুঝব। যে, হ্যাঁ, তুমি আমাদেরকে সত্যিই ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছব্যাস, ক্রু এবং বোটসহ মুক্তি নিয়ে ফিরে যাবে তুমি। আগামীকাল রাতে নিজের বিছানায় আরাম করে ঘুমাতে পারবে।

আপনি মহান, আপনি মহৎ, বললাম তাকে। কিন্তু মনে মনে বললাম, ব্ল্যাঙ্ক আর প্যানথারের চেয়েও নীচ এবং লোভী তুমি, শালা। বিছানায় নয়, তুমি আমাদেরকে সাগরের তলায় ঘুম পাড়িয়ে রাখার মতলব এঁটেছ।

এই প্রথম কথা বলল টালি, একটা কথা, রানা। তুমি গুলি খাবার আগের দিনের ঘটনা। একজন জেলে ওল্ড মেন আর। গানফায়ার ব্রেক-এর দিক থেকে চ্যানেলের ওপারের একটা খাড়িতে নোঙর ফেলা অবস্থায় দেখেছে জলকুমারীকে। আমরা আশা করছি ওদিকেই আমাদেরকে নিয়ে যাবে তুমি।

যদি যেতে চাও, কেন নিয়ে যাব না।

রানা, আমার সাথে ইয়ার্কি মারবে না...।

ভাল কথা, টালিকে জিজ্ঞেস করলাম। এবারের ঘুষের টাকাটা রামাদীনের মাধ্যমে আমাকে ফেরত দেবে তো?

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল টালি। এত বড় স্পর্ধা তোমার...।

প্লীজ, প্লীজ, মাথার ওপর দুহাত তুলে যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানাল হুমায়ুন দাদা। আমরা শান্তি চাই, বিরোধ নয়। এসো, আরেক গ্লাস করে গলায় ঢালা যাক। তারপর প্রিয় বন্ধু, মাসুদ রানা, তুমি আমাদেরকে নিয়ে চল সমৃদ্ধির পথে। তিনজনের গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে, তারপর আবার বলল, একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি একটু সাবধান করে দিতে চাই, রানা, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। উন্নত পানি আমি পছন্দ করি না। সাগর আমার বন্ধু হলে কি হবে, ওর বেয়াদপি আমার ধাতে সয় না। তুমি যদি আমাকে উন্নত পানিতে নিয়ে যাও, মনে রেখ, ভীষণ রাগ করব আমি। আমার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছ তো, নাকি আরও সহজ ভাষায় বলব?

শুধু তোমার জন্যে, হুমায়ুন দাদা, সাগরকে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলব, তাকে অভয় দিয়ে বললাম।

মৃদু মাথা নাড়ল সে, যেন এর চেয়ে কম কিছু আশা করে না।

.

ভোর যেন সাগরের কোল থেকে আড়মোড়া ভেঙে পূর্ণ যুবতী এক সাগর কন্যা উঠে দাঁড়াচ্ছে। শ্যামলা রঙের আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে মুক্তোর শুভ্রতা, বাতাসে ভাসছে এলোমেলো চুলের মত ছেড়া-ছেড়া মেঘ, সূর্যের প্রথম কিরণ লেগে সোনালি রঙ ধরেছে। ইনশোর চ্যানেলের প্রশান্ত পানি আঁকড়ে উত্তর দিকে ছুটছি আমরা। সিদ্ধান্ত হয়েছে জলকুমারী পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নেবে, পেছনে থাকবে ক্রাশবোট। আধ মাইল পেছনে দৌল্যমান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে তাকে। ওল্ড মেন আর গানফায়ার ব্রেকের দিকে এগোচ্ছি আমরা।

খোলা ব্রিজে আমাদের মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক পেছনে রয়েছে টালি। অটোমেটিক রাইফেল হাতে ক্রাশবোটের একজন ক্রু রয়েছে ওর সাথে।

বন্দী দশার প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে গেছে। এখন আমি ঠাণ্ডা মাথায় ফাঁদ কেটে বেরুবার কথা ভাবছি।

জানি, টালি এবং দাদাকে গানফায়ার রীফের ব্রেক দেখানো বা না দেখানো সমান বিপদের কথা। দেখালে অবশ্যই সন্ধান চালাবে ওরা, এবং হয়ত কিছুই পাবে না। কে জানে, নিরো যেটা। তুলেছিল অর্থাৎ এখন যেটা বিগ গাল আইল্যান্ডের জলসীমায় ডুবে। আছে, একমাত্র সেটাই তোলাব জন্যে ব্ল্যাক্স এসেছিল কিনা? তা যদি হয়, গানফায়ার ব্রেকে কিছুই নেই আর।

অথবা আছে, এবং টালি এবং দাদা তা খুঁজেও পাবে।

দুটোর একটা যাই ঘটুক না কেন, আমার অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না তাতে। কিছু যদি না পায়, কথা বলাবাব জন্যে আমার ওপর ইলেকট্রিক টরচার সেটটা ব্যবহার করবে টালি। আর কিছু যদি পায়, তা গোপন রাখার স্বার্থে, আমাকে আর আমার ক্রুদেরকে খুন না করে উপায় নেই ওদের।

অথচ পালাবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

ক্রাশবোটটা আধমাইল পেছনে বটে, কিন্তু ফোরডেকের থ্রি পাউণ্ডার কামান জলকুমারীকে আওতা এবং লক্ষ্যের মধ্যে রেখেছে। সব সময়। বোটে টালি এবং তার বডিগার্ড ছাড়াও সেলুনে রয়েছে আরও তিনজন সশস্ত্র গার্ড, পাহারা দিচ্ছে রডরিক আর ল্যাম্পনিকে।

বোটের সব রসদ শুধু লুট করা হয়নি, রাতের মধ্যে তা খেয়ে সাবাড় করে ফেলাও হয়েছে। সকালে তাই আজ ব্রেকফাস্ট জোটেনি কারও ভাগ্যে, এক কাপ কফি পর্যন্ত নয়।

দিনের প্রথম চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া খাচ্ছি, হঠাৎ মাথার ভেতর ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা বুদ্ধি। নিরাশার অন্ধকারে ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখতে পেলাম আমি। বিষয়টা নিয়ে আর একটু চিন্তা-ভাবনা করলাম। হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু তার আগে রডরিকের পরামর্শ দরকার।

টালি, কাঁধের ওপর দিয়ে বললাম ওকে, ভূইলের দায়িত্ব নেবার জন্যে রডরিককে পাঠিয়ে দাও এখানে। আমাকে একবার নিচে যেতে হবে।

কেন? সন্দেহের সুরে জানতে চাইল টালি। নিচে তোমার কি দরকার?

প্রত্যেকদিন সকালে যে দরকার থাকে মানুষের, যে কাজ আমার হয়ে আর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমাকে দিয়ে এর চেয়ে বেশি বলাতে চাইলে লজ্জা পাব।

এত নাটক জানো! ব্যঙ্গের সুরে বলল সে। থিয়েটারে নাম লেখালে ভাল করতে।

তা যা বলেছ! কিন্তু তাহলে ওল্ড মেন আর গানফায়ার ব্রেকে কে নিয়ে যেত তোমাকে?

উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না টালি। সেলুন থেকে রডরিককে নিয়ে আসার জন্যে গার্ডটাকে পাঠাল সে।

ভুইলটা রডরিককে ছেড়ে দেবার সময় ফিসফিস করে বললাম, ভুইল ধরে থাক, পরে তোমার সাথে কথা বলব। তারপর ককপিটে নেমে গেলাম আমি।

সেলুনে আমাকে ঢুকতে দেখে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ল্যাম্পনির, তার সেই নিঃশব্দ ঝলমলে হাসিটা ফুটে উঠতে যাচ্ছিল মুখে, কিন্তু সশস্ত্র গার্ড তিনজন আধপাক ঘুরে আমার বুকে রাইফেল ধরতেই শুকিয়ে গেল তার চেহারা। আঁতকে উঠে দ্রুত মাথার ওপর হাত তুললাম।

কোন ক্ষতি করতে আসিনি, বলে শান্ত করলাম ওদেরকে, তারপর পাশ কাটিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নামতে শুরু করলাম। দুজন গার্ড অনুসরণ করছে আমাকে। বাথরুমে ঢোকার সময় দেখা গেল ওরাও আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে ভেতরে ঢুকতে চায়। বললাম, ঢুকতে চাও, ঢোক-কিন্তু রাইফেল দুটো বাইরে রেখে যেতে হবে। রাইফেলের মুখে সব কাজ করা সম্ভব নয়।

বোঝা গেল রাইফেল হাতছাড়া করতে রাজি নয় ওরা, তার চেয়ে বাইরে অপেক্ষা করবে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম আমি। আবার যখন দরজা খুললাম, দেখি, সেই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আফ্রিকান নিগ্রো দুজন। চুপি-চুপি আমাকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিয়ে বড়সড় মাস্টার কেবিনে চলে। এলাম। নিঃশব্দে, কিন্তু উৎসাহের সাথে আমার সাথে এল ওরা।

প্রকাণ্ড জোড়া বাঙ্কের নিচে প্রচুর সময় আর খাটনি দিয়ে তৈরি করেছি একটা গোপন লকার। কফিনের মত সাইজ সেটার, ভেন্টিলেটর আছে। নাইট ডিউটিতে যখন কার্গো হিসেবে বডি নিতাম তখন বোট সার্চ করার আশঙ্কা দেখা দিলে এর ভেতর লুকিয়ে ফেলা হত লোকটাকে। আজকাল লকারটাকে ব্যবহার করি মূল্যবান এবং গোপন জিনিস রাখার জন্যে। এখন এর ভেতরে এফ-এন কারবাইনের পাঁচশো রাউণ্ড গুলি, এক বাত্ম হ্যাণ্ড গ্রেনেড এবং দুই কেস ভর্তি স্কচ ভুইস্কি রয়েছে।

উল্লাস-ধ্বনি ছেড়ে রাইফেল দুটো নিজেদের কাঁধের স্ট্র্যাপে আটকে নিল গার্ড দুজন, তারপর নিজেরাই ভুইস্কির কেস দুটো টেনে বের করে নিল। পরমুহূর্তে আমার অস্তিত্বের কথা ভুলে গেল। ওরা। ওদেরকে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম।

ব্রিজে ফিরে এসে রডরিকের পাশে দাঁড়ালাম, কিন্তু ওর কাছ। থেকে ভুইলের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছে করে দেরি করছি।

এত দেরি করলে কেন? পেছন থেকে অসন্তুষ্ট সুরে জানতে চাইল টালি।

ভাল কাজে তাড়াহুড়া করি না কখনও, ব্যাখ্যা দিলাম ওকে। উৎসাহ হারিয়ে ফেলল সে, এগিয়ে গিয়ে পেছন দিকের রেইলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, অনুসরণকারী গানবোটটাকে দেখছে।

রডরিক, ফিসফিস করে বললাম। গানফায়ার ব্রেক। তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে তীরের দিক থেকে রীফ পেরোবার একটা প্যাসেজ আছে ওখানে।

ফোলা-ফাঁপা জোয়ারের সময়, একটা হোয়েল বোট এবং শত্রু নার্ডের একজন দক্ষ নাবিকের জন্যে শুধু, স্বীকার করল রডরিক। অল্পবয়সী পাগল ছিলাম তখন, ভয়ডর ছিল না, তাই ওই মরণের পথে পা বাড়িয়েছিলাম।

আর তিন ঘন্টা পর জোয়ার আসবে। জলকুমারীকে নিয়ে যেতে পারব আমি? জানতে চাইলাম।

চোখ কপালে উঠে গেল রডরিকের। ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড বোকার মত তাকিয়ে থাকল আমার মুখের দিকে। জেসাস! চাপা স্বরে বলল সে।

পারব বলে মনে কর? ধৈর্য হারিয়ে জানতে চাইলাম।

আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকাল রডরিক, চিন্তিতভাবে ঠোঁটের নিচে কালো মোটা আঙুল ঘষছে, কুঁচকে আছে ভুরুজোড়া। তারপর ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকাল ও। দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে ওকে। জানি না, মাসুদ। পারবে এমন কাউকে চিনি না আমি। তুমি...শুধু তুমি হয়ত পারতে পার...কিন্তু আমি শিওর নই, ম্যান।

বিয়ারিঙ দাও, রডরিক-কুইক!

অনেক দিন আগের কথা, কিন্তু... এগোবার রাস্তা এবং ব্রেক-এর প্যাসেজটার ছবির মত বর্ণনা দিল ও। তিনটে বাঁক আছে প্যাসেজে-বাম, ডান তারপর আবার বাম, তারপর পাবে সরু একটা গলা, দুদিকেই প্রবালের উঁচু মাথা। জলকুমারী ভেতর দিয়ে যেতে পারবে কি না জানি না আমি, যদিও বা যেতে পারে, কিছু রঙ পেছনে রেখে যেতে হবে ওকে। এরপর মেইন রীফের পেছনে বড় একটা পুলে পৌছাবে তুমি। ওখানে বোট ঘোরাবার জায়গা আছে, অপেক্ষা করে যখন দেখবে সাগরের মতিগতি এর চেয়ে ভাল আশা করা যায় না তখন বিসমিল্লাহ বলে ফাঁকের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে আসবে থোলা সাগরে।

ধন্যবাদ, রডরিক, নিচু গলায় বললাম ওকে। এবার তুমি নিচে গিয়ে অপেক্ষা কর। গার্ডদেরকে কয়েক বোতল হুইস্কি দিয়ে এসেছি। ব্রেক-এর কাছে পৌঁছুবার আগেই বন্ধ মাতাল হয়ে পড়বে ওরা। ডেকে তিনবার পা ঠুকে সিগন্যাল দেব আমি, এরপর তুমি আর ল্যাম্পনি যেভাবে পার রাইফেল দুটো কেড়ে নিয়ে বেঁধে ফেলবে ওদেরকে।

সে-ব্যাপারে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, ম্যান! চাপা একটু হেসে বিদায় নিল রডরিক।

বেশ অনেকটা ওপরে উঠে এল সূর্য, ওল্ড-মেন-এর তিন চুড়া। সামনে মাত্র কয়েক মাইল দূরে কালো মেঘের মত দেখা যাচ্ছে, এই সময় প্রথম নিচে থেকে ভেসে এল হাসি চিৎকার আর ফার্নিচার ভাঙার শব্দ। ব্যাপারটা খেয়াল করল না টালি। এখন ইনশোর চ্যানেলের শান্ত পানির ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে এগোচ্ছি আমরা গানফায়ার রীফ-এর উল্টো দিক লক্ষ্য করে। রীফ-এর উঁচু-নিচু সারি এখন

দেখতে পাচ্ছি আমি, প্রাচীন একটা হাঙ্গরের কালো দাঁতের মত। পেছনে উঁচু সাদা সামুদ্রিক ফেনার ঝলক দেখা যাচ্ছে, আরও পেছনে পড়ে আছে থোলা সাগর।

সামান্য একটু ফাঁক করলাম থ্রটলঃ ইঞ্জিনের শব্দ বদলে গেল একটু, কিন্তু টালির কানে পার্থক্যটা ধরা পড়ল না। রেইলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। দাড়ি কামানো হয়নি, থিড়েয় চো চো করেছে পেট, সম্ভবত বিরক্তি বোধ করেছে নিজের ওপর। এখন আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি প্রবালের গায়ে ধেয়ে আসা ফেনার পাহাড় আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়ার গুরুগম্ভীর আওয়াজ। এবং নিচে থেকে অবিরাম ভেসে আসছে মাতালদের উল্লাস, এটা সেটা ভাঙার শব্দ। অবশেষে টনক নড়ল টালির। ব্যাপারটা কি জানার জন্যে গার্ডটাকে নিচে পাঠিয়ে দিল সে। অত্যন্ত উৎসাহের সাথে নিচে নেমে গেল লোকটা। গেল তো গেলই, আর ফিরল না।

পেছন দিকে তাকালাম। জলকুমারীর স্পীড বেড়ে যাওয়ায় দুই বোটের মধ্যবর্তী ফাঁকটা ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করেছে, ক্রমশ একনাগাড়ে রীফের দিকে এগোচ্ছি আমরা।

সামনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে রডরিকের দেয়া বিয়ারিং আর চিহ্নগুলো খুঁজতে শুরু করেছি। হালকাভাবে ধরে আরেকটু ফাঁক করলাম থ্রটল দুটো। আরেকটু পিছিয়ে পড়ল ক্রাশবোট।

অকস্মাৎ মাত্র একহাজার গজ সামনে গানফায়ার ব্রেক-এর প্রবেশ পথটা দেখতে পেলাম, প্রকৃতির অত্যাচার সওয়া বুড়ো দুই প্রবাল পাথরের মাথা চিতি করেছে সেটাকে। প্রবাল প্রাচীরের ফাটা দিয়ে ঢুকছে বিশাল সাগর প্রবাহ, স্বচ্ছ পানির হালকা রঙের তফাৎ দৃষ্টি এড়াল না আমার।

নিচ থেকে উন্মত্ত হাসির শব্দ ভেসে এল, সেইসাথে সেলুন থেকে গড়িয়ে ককপিটে বেরিয়ে এল একজন নেশাগ্রস্ত ক্রু। রেইলের সাথে ধাক্কা খেল সে, সেটা ধরে কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে, অঁক অঁক শব্দ পাচ্ছি। বমি করার। পারমুহূর্তে হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল সে। পড়েই রইল ডেকের উপর।

চৌঁচিয়ে উঠে খ্যাপা ষাঁড়ের মত মইয়ের দিকে ছুটল টালি। নিচে নেমে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সে। এই সুযোগে আরও দুই ডিগ্রী খুলে দিলাম থ্রটল দুটো। ক্রাশবোটের কাছ থেকে যথাসম্ভব এগিয়ে থাকতে

হবে আমাকে। থ্রি পাউণ্ডার কামানের কাছ থেকে আধ ইঞ্চি বেশি দূরে থাকারও জীবন-মরণ গুরুত্ব আছে এখন।

ঠিক করেছি তির্যক ভাবে না এগিয়ে চ্যানেলের মুখের সাথে সমান্তরাল রেখায় নিয়ে যাব বোট, তারপর সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে। ডাইভ দেব চ্যানেলের ভেতর। এতে অবশ্য প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে। কোনাকোনিভাবে একেবেঁকে এগোলে প্রবালের ডুবন্ত চওড়া ফণার সাথে জলকুমারীর কীল-এর ঘষা খাওয়ার আশঙ্কা কম, কিন্তু এর ফলে হুমায়ুন দাদার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করা হবে। চালাকি করতে যাচ্ছি বুঝতে পারলেই কামান দাগবে সে। এই ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।

আধমাইল লম্বা, অত্যন্ত সরু চ্যানেলটা। অগ্নিপরীক্ষা শুরু হবে ওটার ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে। তারপরই খোলা সাগর। চ্যানেলে ঢোকার পর বেশিরভাগ সময়ই প্রবালের মাথা-উঁচু স্তম্ভের আড়ালে থাকবে জলকুমারী, এবং আঁকাবাঁকা পথে আমরা যখন ছোটব সামনের থ্রি পাউণ্ডারের গানাররা লক্ষ্যস্থির করে গোলা ছুঁড়তে বাধার সম্মুখীন হতে থাকবে। আরও আশা করছি ফাঁকটা। দিয়ে তেড়ে আসা ঢেউগুলো জলকুমারীকে নাগরদোলায় চড়িয়ে কখনও উঁচুতে তুলবে কখনও নিচে নামাবে-দূর থেকে গানাররা ঢেউয়ের উচ্চতা এবং ধরন-ধারন কিছুই টের পাবে না, ফলে জলকুমারীর আচরণ সম্পর্কেও আগে থেকে কিছু অনুমান করা। সম্ভব হবে না ওদের পক্ষে।

এবং একটা ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত আমি, লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার হুমায়ুন দাদা চ্যানেলে ঢুকে আমাদেরকে ধাওয়া করার ঝুঁকি নেবে না। ফলে ক্রাশবোটের সাথে আমাদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়বেই, গানারদের জন্যে এটাও একটা অসুবিধে সৃষ্টি করবে।

নিচের হৈ-হউগোলে কান না দিয়ে একনাগাড়ে এগিয়ে আসা চ্যানেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সিদ্ধান্তটা নিয়ে জীবনের। সবচেয়ে বড় ভুল করেছি কিনা জানি না, ভাবছি, সামনে পেছনের। এতগুলো দুর্লভ বাধা শেষ পর্যন্ত টপকাতে পারব তো?

মই বেয়ে তর তর করে উঠে এল টালি। রাগে কাঁপছে সে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, ওদেরকে তুমি মদ খেতে দিয়েছ, রানা! এর জন্যে তোমাকে আমি...।

আমি? অবাক হয়ে বললাম। আরে না, ভুল করছ তুমি। আমি কেন দেব, ওরাই তো চাইল আমার কাছে।

দাঁতে দাঁত ঘষল টালি। তারপর হঠাৎ তাকাল বোটের পেছন দিকে। ক্রাশবোট এখন এক মাইল পেছনে এবং দূরত্ব আরও বেড়েই চলেছে।

তুমি কোন মতলব ঐটেছ! চাঁচিয়ে উঠে সিল্ক জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল টালি।

ঠিক সেই সময় চ্যানেলের মুখের সাথে সমান্তরাল রেখায় পৌঁছুল জলকুমারী। দুটো থ্রটলই সম্পূর্ণ খুলে দিলাম আমি। ছুটন্ত অবস্থা থেকে লাফ দিল বোট, আরও জোরে ছুটতে শুরু করল।

পকেট হাতড়াচ্ছে টালি, এই সময় টলে উঠল সে। ধাক্কাটা সামলাতে গিয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা, অশ্রাব্য গালিগালাজ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

বন বন করে ডানদিকে সবটুকু ঘুরিয়ে লক করে দিলাম হুইল। ব্যালে নর্তকীর মত বিন্ করে ঘুরে গেল জলকুমারী। পিছু হটছে টালি, বোর্টের সাথে সে-ও দিক বদল করল। অকস্মাৎ ছিটকে পড়ল সে, ডেক পেরিয়ে দড়াম করে গিয়ে পড়ল হুইলের ওপর। বাক নেয়া মাত্র শেষ করবে বোট, কাত হয়ে গেছে একদিকে। পকেট থেকে ছোট্ট একটা পয়েন্ট টু-ফাইভ অ্যান্ট্রা পিস্তল বের করেছে টালি, কিন্তু শরীরের নিচে চাপা পড়ে গেছে পিস্তল ধরা হাতটা।

এক মুহূর্তের জন্যে বোটের হুইল ছেড়ে এগোলাম আমি। ঝুঁকে পড়লাম, একহাতে ধরলাম টালির গর্দান। অপর হাতটা হাঁটুর পেছনে রেখে শূন্যে তুলে নিলাম ওকে। আমার গলা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল ও। ঝামেলা বিদায় হও এবার, বললাম ওকে। কোনরকম সুযোগ না দিয়ে রেইলের ওদিকে ছুঁড়ে দিলাম ওকে।

বারো ফুট নেমে গেল টালি, লোয়ার ডেকের রেইলে প্রচণ্ডভাবে বাড়ি খেল মাথাটা, তারপর অগোছাল ভঙ্গিতে ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে।

তিন লাফে ফিরে এলাম ভইলের কাছে। এক ঝটকায় লক খুলে বন বন করে ঘোরাতে শুরু করলাম ভইলটা। সিধে হয়ে গেল জলকুমারী। পরমুহূর্তে তিনবার পা ঠুকলাম আমি ডেকের ওপর।

বারো

সোজা প্রবেশপথের দিকে তাক করলাম বোট। নিচে থেকে ধস্তাধস্তির আর চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে, তারপরই টেনে কাপড় ছেড়ার মত ফড়ফড় শব্দে গর্জে উঠল সাব-মেশিনগান, আমার পেছনের ডেক ফুটো করে উঠে এল বুলেটগুলো। ছাদে গুলি করেছে ওরা, সম্ভবত রডরিক এবং ল্যাম্পনি আহত হয়নি।

দুই সারি প্রবালের মাঝখানে ঢুকতে যাচ্ছি আমরা, ঠিক আগেরমুহূর্তে আরেকবার পেছন দিকে তাকলাম। ক্রাশবোট। এখনও এক মাইল দূরে। আর ডেউয়ের দোলায় দুলছে টালির মাথাটা। বোট, নাকি হাঙ্গর, কে ওর কাছে আগে পৌঁছবে বলা মুশকিল।

এরপর সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত করে নিলাম মনটাকে। চ্যানেলের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে জলকুমারী। যে কাজ। করতে যাচ্ছি, সেটার চেহারা সামনে চাম্ফুষ দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি।

ঝুঁকে হাত বাড়ালেই দুদিকের বেঁটে প্রবাল স্তম্ভ ছুঁতে পারি। সামনের অল্প পানির নিচে দেখতে পাচ্ছি কদাকার চেহারার প্রবালের ফণা নানান বিচিত্র ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। চ্যানেল ধরে লম্বা আঁকাবাঁকা পথ পাড়ি দিয়ে তেজ এবং কুবুদ্ধি খসে গেছে। পানির স্বভাব থেকে, কিন্তু যতই ভেতরে ঢুকছি আমরা ততই আবিষ্কার করছি তার উন্মত্ত চেহারা। সেই সাথে ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে জলকুমারীর ভবিষ্যৎ, আমার নির্দেশে সাড়া না দেবার প্রবণতা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তার আচরণে। কন্ট্রোল সিস্টেম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

চ্যানেলের প্রথম বাকটা দেখতে পাচ্ছি সামনে। সেদিকে নিয়ে যাচ্ছি জলকুমারীকে। যতটা না আমার নির্দেশে, তার চেয়ে বরং নিজের ইচ্ছায় ঘুরে যাচ্ছে সে, আত্মহত্যাপ্রবণ ঝোঁকের বশে একদিকের গা পানি থেকে শূন্য তুলে ডানদিকের ভয়ালদর্শন প্রবাল স্তম্ভে ধাক্কা খেতে যাচ্ছে। সবিস্ময়ে আঁতকে উঠলাম আমি। পরমুহূর্তে কথা শুনল জলকুমারী, স্তম্ভটাকে ছুঁয়েও ছুঁলো না সে। বাঁকের পর সামনে দেখতে পাচ্ছি সরল চ্যানেল। ঠিক এই সময় মই কাঁপিয়ে ওপরে উঠে এল রডরিক। তার কপালে ভুরুর ওপর ছোট একটা ক্ষত, সেটা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

নিচে সব ঠিক আছে, ম্যান, শান্তভাবে বলল সে। ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে ল্যাম্পনি। সাহেব পুলিশটা কোথায় গেল?

একটু সাঁতার কাটতে গেছে, চ্যানেল থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বললাম ওকে। ক্রাশবোটটা কোথায়? কি করছে ওরা?

একই অবস্থা। এখনও ডোবেনি। এক মিনিট, ম্যান... কণ্ঠস্বর বদলে গেল রডরিকের, ...হ্যাঁ, ভয়ের ব্যাপার। ডেক গানটার কাছে লোকজন দেখতে পাচ্ছি। গোলা ছুঁড়তে যাচ্ছে।

চ্যানেল ধরে দ্রুত এগোচ্ছি আমরা, পেছন দিকে একনজর তাকাবার ঝুঁকি নিলাম আমি। সেই মুহূর্তে দেখলাম সাদা করডাইট ধোঁয়া বেরিয়ে এল থ্রি-পাউণ্ডার থেকে। তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে মাথার অনেক ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা শেল, প্রায় একই সাথে শোনা গেল কামান দাগার আওয়াজটা।

তৈরি হও, ম্যান। বাঁ দিকের বাঁকটা এগিয়ে আসছে।

কিভাবে কি ঘটছে এখন আর সেদিকে খেয়াল নেই আমার। বাঁকটা নেবার সময় একাধিক ভয়ঙ্কর বিপদ দেখতে পেলাম জলকুমারীর দুপাশে এবং সামনে, কিন্তু একটু পরই আবিষ্কার করলাম বাঁক নেয়া শেষ করেছি আমরা। ঠিক এই সময় আমাদের রীফের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা প্রবাল স্তম্ভের মাথা চুরমার হয়ে গেল পরবর্তী গোলায়, নীল ধোঁয়ার মেঘে ঢাকা পড়ে গেল ওদিকটা।

বাঁক নিয়ে পঞ্চাশ গজও এগোইনি, তৃতীয় শেলটা ছুটে এল আমাদের দিকে।

আসছে, ম্যান!

রডরিকের চিৎকার শুনে হ্যাৎ করে উঠল বুকটা। তাকাবার। সাহস হল না আমার। হঠাৎ সামনের সাদা পানি বিশাল একটা স্তম্ভের আকার নিয়ে খাড়া হয়ে গেল, উচ্চতায় আমাদের ব্রিজটাকে ছাড়িয়ে গেল সেটা, তারপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে শুরু করল। কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ঝম ঝম বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম আমরা।

এর মধ্যে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছি। একের পর এক আমাদের দিকে তেড়ে আসছে ঢেউ, কোনটাই হয় ফুটের কম উঁচু নয়। প্রবাল প্রাচীরে বাধা পেয়ে সেগুলো আরও বন্য, আরও উন্মত্ত হয়ে উঠছে।

ক্রাশবোটের গোলন্দাজরা লক্ষ্যভেদ করার ব্যাপারে যে আনাড়িপনার পরিচয় দিচ্ছে তাতে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমি। একটা শেল বিস্ফোরিত হল বোটের পাঁচশো গজ পেছনে, তার পরেরটাই ছুটে গেল আমার আর রডরিকের মাঝখান দিয়ে, অগ্নিগোলকটার হাওয়া লাগল আমার গালের পাশে এবং হাতে, বাতাসের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেলাম ডেকের ওপর। অবশ্য সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়লাম আবার।

এইবার গলাটা আসছে! কাঁপা, উদ্ভিগ্ন কণ্ঠে বলল রডরিক।

সামনে তাকিয়ে দেখি ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে চ্যানেলটা, এত সরু দেখে কলজে শুকিয়ে গেল আমার। ব্রিজ সমান উঁচু দুটো প্রবালের ভয়ালদর্শন মাথা পাহারা দিচ্ছে অপ্রশস্ত প্যাসেজটাকে। এর ভেতর জলকুমারী ঢুকবে কিভাবে ভেবেই পাচ্ছি না।

ভুল-ত্রুটি করে থাকলে মাফ করে দিয়ো, রানা!

রানা! রডরিকের মুখে এই প্রথম শুনলাম।

থ্রটল দুটো এখনও পুরো খোলা, সেই অবস্থায় সরু প্যাসেজের দিকে তাক করলাম বোট। দুহাতে রেলিংটা আঁকড়ে ধরে আছে রডরিক, ওর মুঠোর চাপে স্টেনলেস স্টীল বেঁকে যাচ্ছে কিনা সন্দেহ হল আমার।

সরু প্যাসেজ অর্ধেক পেরিয়ে এসে ধাক্কাটা খেলাম আমরা। বোটের ধাতব শরীরের সাথে প্রবালের একটানা ঘষা কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হল, কর্কশ আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তারপর প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল জলকুমারী, প্রায় স্থির হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে, ইতস্তত করছে।

এই সময় আরেকটা শেল বিস্ফোরিত হল বোটের পাশে। প্রবাল আর ইস্পাতের টুকরো এসে পড়ল ব্রিজে।

প্রবাল পাঁচিলের গায়ের সাথে স্টারবোর্ড সাইড প্রচণ্ড ঘষা খাচ্ছে, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে আবার ছুটতে শুরু করেছে জলকুমারী। কিন্তু এর একটু পরই আবার প্রায় স্থির হয়ে গেল বোট, এবার বোধহয় নিরুপায় ভাবে আটকে গেছে।

তারপর আরেকটা বড়সড় সবুজ চেউ ছুটে এসে প্রবালের দাঁত থেকে মুক্ত করে তুলে ধরল জলকুমারীকে, চেউটার মাথা থেকে ডাইভ দিয়ে পড়ল সে, এবং প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

নিচে যাও, রডরিক, চিংকার করে বললাম। খোলে গর্ত হয়েছে কিনা দেখ।

ভুরু থেকে রক্ত মুছে মইয়ের দিকে ছুটল রডরিক।

সামনে খানিকটা খোলামেলা পানি দেখে চট করে ক্রাশবোটের দিকে তাকালাম আরেকবার। প্রবালের আড়ালে পড়ে গেছে সেটা, মুহূর্তের জন্যে আংশিক দেখতে পেলাম সেটাকে কিন্তু এখনও অবিরাম ফায়ার করে যাচ্ছে। চ্যানেলের মুখে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হল, সম্ভবত পানিতে টালিকে খুঁজছে অথবা তাকে তোলার চেষ্টা করছে। যাই হোক, এখন আর হুমায়ুন দাদা আমাদেরকে অনুসরণ করবে না, জানি আমি। ওল্ড মেন-এর পেছন দিক থেকে মেইন চ্যানেল ঘুরে আসতে চার ঘন্টা সময় লাগবে তার।

চ্যানেলের সর্বশেষ বাঁকটা দেখতে পাচ্ছি এখন সামনে। জলকুমারীর কীলের সাথে আবার ঘষা লাগল প্রবালের, কর্কশ শব্দটা আমার কলজেতে গিয়ে লাগছে। তারপর অকস্মাৎ বেরিয়ে এলাম আমরা মেইন রীফ-এর পেছন দিকের গভীর পুলে।

গোল একটা বৃত্তের মত পুলটা, তিনশো গজ চওড়া, প্রায় সবটা ঘিরে রেখেছে প্রবাল পাঁচিল-শুধু গানফায়ার বেক-এর ফাঁকটা খোলা, ভারত মহাসাগরের বিস্ফুর্ত, উত্তাল সবুজ চেউয়ের। নির্বিঘ্ন প্রবেশ পথ ওটা।

ফিরে এসে আমার কাঁধের কাছে দাঁড়িয়েছে রডরিক। হুঁদুরের কানের মত নিচ্ছিদ্র, ম্যান। একটা ফোঁটাও নিচ্ছে না জলকুমারী।

নিঃশব্দে প্রিয়তমার প্রশংসা করলাম আমি।

ওদিকে রীফের আধমাইল পেছন থেকে এই প্রথম ক্রাশবোটের গোলন্দাজরা পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছে আমাদেরকে। এটাই তাদের শেষ সুযোগ বুঝতে পেরে দ্রুত একের পর এক কামান দাগতে শুরু করেছে।

বোটের চারধারে ঘন ঘন লাফিয়ে উঠছে পানি-এত কাছাকাছি এসে পড়ছে প্রতিটি শেল এবং কিছু করার উপায় নেই দেখে। হতভম্ব হয়ে পড়ছি আমি। ঘোরের মধ্যেই ঘুরিয়ে নিলাম বোট, সরু ব্রেক-এর দিকে তাক করে গানফায়ার রীফ-এর ফাঁকটার দিকে ছুটিয়ে দিলাম তাকে।

যাই ঘটুক, ফেরার উপায় নেই আর, বুঝতে পেরে কুঁকড়ে উঠল আমার তলপেটের ভেতরটা। ফাঁকটার ভেতর দিয়ে খোলা সাগরের দিকে তাকাতেই শিউরে উঠলাম আতঙ্কে। আমার সামনে গোটা সাগর যেন পিছু হটে বিশাল বিকট মূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে-ছোট্ট বোটটাকে আক্রমণের তার এই দানবীয় আয়োজনটা দেখে ভয়ে এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

দেখছ, রডরিক! গলার ভেতর থেকে নিজের অজান্তেই ফাপা আওয়াজটা বেরিয়ে এল।

রডরিকের বিস্ফারিত দুই চোখে পলক নেই, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, সাগরের আলোড়ন সম্মোহিত করে ফেলেছে ওকে। আমার কথা কানে যায়নি ওর।

কিন্তু ক্রম্বেপ নেই অকুতোভয় জলকুমারীর। অসম সাহসের সাথে ছুটে যাচ্ছে সে সর্বগ্রাসী উত্তাল সাগরের সাথে বোঝাপড়ার জন্যে।

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে এইবার যেন আক্রমণের জন্যে ধেয়ে আসছে সাগর।

আক্রোশে অন্ধ একটা দানব কাঁধ তুলছে যেন, মাথা চাড়া দিয়ে প্রতি মুহূর্তে উঠে যাচ্ছে ওপরে, আরও ওপরে-সবুজ রঙের দুর্গ প্রাচীরের মত বিশাল একটা ঢেউ সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুনিয়াটাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি তার এগিয়ে আসার রোমহর্ষক শব্দ-দাবানলে আক্রান্ত বনভূমির আর্তনাদের মত শোনাচ্ছে অনেকটা।

আরেকটা শেল মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল, কিন্তু সেটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না। ইতিমধ্যে মাথা তুলতে শুরু করেছে জলকুমারী, পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউটার গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে সে চূড়ার দিকে।

উঁচু মাথাতে পানির রঙ হালকা হয়ে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে-এবং জলকুমারী যেন একটা এলিভেটর, আমাদেরকে নিয়ে দিব্যি উঠে যাচ্ছে টপফ্লোরে। খাড়া হয়ে যাচ্ছে ডেক, বুকের সাথে রেইল চেপে ধরে অসহায় ভাবে ঝুলছি আমরা।

পেছন দিকে উল্টে যাচ্ছে বোট, আর্তনাদ বেরিয়ে এল রডরিকের গলা থেকে। ডু সামথিং, ম্যান! ফর গডস সেক, ডু সামথিং...

পাগলের প্রলাপ বকছে রডরিক। ও নিজেও তা জানে।

লেজের ওপর দাঁড়াতে শুরু করেছে জলকুমারী। ঢেউ ছুঁড়ে বেরিয়ে যা! ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল আমার। দাঁতে দাঁত চেপে আছি। সবুজ কেটে বেরিয়ে যা। আমার কথা যেন শুনতে পেল জলকুমারী। ঢেউয়ের বিশাল ফণাটা বোটের গায়ে বিধ্বস্ত হবার এক সেকেন্ড আগে সেটার ভেতর ধারাল বো চুকিয়ে দিল সে।

সগর্জনে নেমে এল সবুজ ঢেউয়ের মাথাটা বোটে, বো থেকে। স্টার্ন পর্যন্ত ডুবে গেল ছয় ফুট পানির নিচে, প্রচণ্ড ধাক্কায় একদিকে কাত হয়ে গেল জলকুমারী। তারপর হঠাৎ ঢেউয়ের পেছনের গা ছুঁড়ে বেরিয়ে এলাম আমরা শূন্য-নিচে, অনেক নিচে একটা অন্ধকার পাতাল দেখা যাচ্ছে। নাক নিচু করে ঝাঁপিয়ে। পড়ছে সেদিকে বোট, পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি উল্টেপাল্টে যাচ্ছে আমাদের।

নিচে পড়ার সাথে সাথেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম আমরা, আমি আর রডরিক ছিটকে পড়লাম রেলের কাছ থেকে ডেকের ওপর। মুহূর্তের জন্যে অচল হয়ে পড়ল জলকুমারী, কিন্তু আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই গা ঝাড়া দিয়ে কয়েক টন পানি ফেলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল সে, দুদাড় গতিতে ছুটতে শুরু করেছে পরবর্তী চেউটার সাথে বোঝাপড়া করতে।

আগেরটার চেয়ে ছোট এটা, ফণাটাকে তোয়াক্কা না করে সেটার মাথায় চড়ে উল্লাসে একটু দুলে নিল পাগলি। দ্যাটস মাই ভারলিং! চিৎকার করে উৎসাহ দিলাম আমি। গতি ফিরে পাচ্ছে। সে, তৃতীয় চেউটাকেও গায়ে চড়তে না দিয়ে নিজেই চড়াও হল তার ওপর, সাবলীল ভঙ্গিতে নেমে এল আবার নিচে।

কাছাকাছি কোথাও আবার একটা থ্রি-পাউন্ড শেল কড়াক করে বিস্ফোরিত হল, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা বেরিয়ে এসেছি গানফায়ার ব্রেক থেকে, আকাশের নিচে লম্বা দিগন্তরেখার দিকে ছুটছি। আর

মদ খেয়ে ককপিটে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল যে গার্ডটা, তার কোন হৃদসই পাওয়া গেল না বোটে। আমরা ধরে নিলাম বড় চেউটা তাকে টেনে নিয়ে গেছে সাগরে। বাকি তিনজনকে আমরা সেন্ট মেরী ত্রিশ মাইল দূরে থাকতেই ছোট্ট একটা দ্বীপে নামিয়ে রেখে এলাম। ওখানে একটা কুয়া আছে এবং মেইনল্যান্ডের জেলেরা প্রায়ই পানি খেতে যায়।

ঝোড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে জলকুমারী যখন গ্র্যাণ্ড হারবারে ঢুকল তখন রাত হয়ে গেছে। জেটির কাছ থেকে অনেক দূরে নোঙর ফেললাম আমি। বোটের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দ্বীপবাসীদের আলোচনার খোরাক হয়ে উঠুক তা চাই না। ডিঙি নৌকো নিয়ে তীরে গেল রডরিক আর ল্যাম্পনি। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে মাস্টার কেবিনের জোড়া বাল্কে শুয়ে পড়লাম এবং প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও তখুনি ঘুম এসে গেল।

পরদিন সকাল নটায় আমার ঘুম ভাঙল জুড়িখ। মাছের কেক আর বীফ স্টেক দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে ল্যাম্পনি।

বোট মেরামতের জন্যে যা যা লাগবে কিনতে গেছে ওরা মা এডির দোকানে, বলল সে।

গোথ্রাসে ব্রেকফাস্ট সেরে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালাম, দাড়ি কামালাম, তারপর ফিরে এসে দেখি তখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে জুডিথ। বুঝলাম, কিছু বলতে চায়।

আনাড়ি হাতে ক্ষতগুলো নতুন করে ড্রেসিং করছি দেখে মৃদু তিরস্কার করল আমাকে, তারপর নিজেই শুরু করল কাজটা।

মিস্টার রানা।

ইয়েস, মিসাস ল্যাম্পনি, সহাস্যে বললাম।

কিন্তু হাসছে না জুডিথ। মুখটা ল্লান। একটা কথা।

মাত্র?

তবু হাসল না জুডিথ। আপনি চান, মিস্টার রানা, আমার ল্যাম্পনি খুন হোক বা সারা জীবন জেল খেটে মরুক? আপনারা যদি এভাবে চলতে থাকেন, যেভাবে হোক তীরে আটকে রাখব ওকে আমি।

ভারি মজার কথা, জুডিথ, ওর উদ্বেগ দেখে হাসলাম আমি। তা এক কাজ করলেই তো হয়, তিন বছরের জন্যে ওকে রাখানো দ্বীপে পাঠিয়ে দিলেই তো পার। আমার বিশ্বাস তিনটে বছর নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে তুমি।

আপনি নিষ্ঠুরের মত কথা বলছেন, মিস্টার রানা।

জীবনটাই বড় নিষ্ঠুর, জুডিথ, আরও নরম সুরে বললাম। ওকে। ভুলে যাচ্ছ কেন, ল্যাম্পনি আর আমি যা কিছু করছি জীবিকার জন্যেই করছি। বোটটাকে পানির ওপর ভাসিয়ে রাখার জন্যে কিছু কিছু ঝুঁকি আমাকে নিতেই হয়। কোন কোন সময় ল্যাম্পনি আমার সাথে থাকে। গির্জার কাছে একটা বাড়ি কেনার মত টাকা জমিয়েছে ও, এই টাকার প্রতিটি পয়সা ও এই বোটের মাধ্যমে খেটে রোজগার করেছে।

চুপচাপ ড্রেসিং শেষ করল জুডিথ। বিদায় নিয়ে যখন ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে, ওর হাত ধরে কাছে টানলাম। কিন্তু আমার চোখে তাকাল না ও। ওর চিবুক ধরে মুখটা তুললাম ওপর দিকে। সুন্দর, নিটোল একটা মুখ। দেখে মায়া লাগে। খামোকা ভয় পেয়ো না, জুডিথ। ও আমার ছোট ভাইয়ের মত। ওর দিকে। আমার নজর আছে। থাকবে।

অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জুডিথ। অন্তর থেকে বলছেন আপনি, তাই না, মিস্টার রানা?

অন্তরের অন্তস্তল থেকে, জুডিথ।

বিশ্বাস করলাম, অবশেষে বলল সে, তারপর ঝিক করে হাসল। আর ভয় করব না।

ও যখন দরজার কাছে, পেছন থেকে চিৎকার করে বললাম, আমার নামে তোমাদের একটা বাচ্চার নাম রেখ, বুঝেছ!

প্রথম বাচ্চার, মিস্টার রানা, দৌড় শুরু করে চাঁচিয়ে উঠল সে-ও। কথা দিলাম!

.

কথায় বলে, ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে সাথে সাথে আবার তার ওপর চড়তে হয়-তাতে ভয়টাকে হার মানানো যায়, মিস্টার রানা, বলল ঢ্যাঙা রামাদীন।

ওর ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিসে বসে আছি আমি। ইন্সপেক্টর পিটার টালির আচরণ সম্পর্কে এইমাত্র আলোচনা শেষ করেছি আমরা। অবশ্য, টালি যাই করে থাকুক, তাতে রামাদীনের এতটুকু স্বার্থহানি হয়নি। নিজের কমিশন তো সে আগেই পকেটস্থ করে নিয়েছে। এখন আমরা আলোচনা করছি। পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে।

বললাম, বডি, বক্স, স্টিক-সব কিছুতে রাজি আমি, মি. রামাদীন। মোটকথা, পার্টি চাই আমি। তবে জীবনের দাম বেড়ে গেছে কিনা, তাই প্রতি নাইট-ডিউটির জন্যে দশ হাজার ডলারের কম নেব না-এবং সবটা অ্যাডভান্স চাই।

এমন কি ওই মজুরিতেও আপনাকে আমি কাজ পাইয়ে দেব।

বুঝলাম, এতদিন আমাকে ঠকাচ্ছিল রামাদীন। তাড়াতাড়ি।

খুব তাড়াতাড়ি, রাজি হল সে। আপনি ভাগ্যবান। ইন্সপেক্টর টালি সেন্ট মেরী দ্বীপে আর কখনও ফিরে আসবে বলে মনে করি না। ওকে যে কমিশনটা দিতেন, সেটা আপনার লাভের ঘরে জমা হবে।

এটুকু দয়া তার কাছে পাওনা হয়েছে আমার।

পরবর্তী ছয় হপ্তায় তিনবার নাইট ডিউটিতে গেলাম আমরা। দুটো বডি, একটা বক্স-সবগুলো মৌজাস্থিক জলসীমার মধ্যে, নদীগুলোর ভেতর দিকে পি. সি. আই. হালকা কিছু কাজ মাঝেমাঝেই দিত আমাকে, বডি পাচার করার ওই দুটো কাজও রামাদীনের মাধ্যমে ঢাকা অফিস দিল আমাকে। এ ব্যাপারে রামাদীনের অবশ্য কিছুই জানার কথা নয়।

বিদেশী শাসিত দুই আফ্রিকান রাষ্ট্রের দুজন জাতীয়তাবাদী। নেতা ছিলেন ওঁরা, স্বাধীনতা আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার জন্যে কাজ করছিলেন, কিন্তু বিদেশী প্রভুরা তাদের তৎপরতা পছন্দ করেনি। ওঁদেরকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়। অগত্যা দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয় ওঁদেরকে। দেশের বাইরে থেকে সংগঠনের কাজ করার সুযোগ চাইছিলেন ওঁরা। পি. সি, আই-এর ঢাকা অফিস ওঁদেরকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আর বক্সে ছিল গোলা বারুদ। তাও মুক্তি পাগল আফ্রিকান নিগ্রোদের সাহায্যেই পাঠানো হচ্ছিল।

তিনটে নাইট ডিউটি থেকে আঠারো হাজার ডলার আয় করি আমরা, ব্যর্থ মওসুমের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার জন্যে যথেষ্ট। তারচেয়ে বড় কথা, কাজের মাঝখানে প্রচুর অবসর আর বিশ্রাম পাওয়ায় আমার ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেল, এবং আগের শক্তি ফিরে এল শরীরে। প্রথম দিকে বাড়ির সামনে

পাম গাছের ছায়ায় অলসভাবে শুয়ে বসে বই পড়ে সময় কাটলাম। তারপর শক্তি ফিরে আসার সাথে সাথে রোদ পোহাতে শুরু করলাম, সাঁতার কাটলাম, মাছ ধরলাম।

তবে, ডাক্তার ডানিয়েলের কথাই ঠিক। বাঁ হাতের ওপর দিকটা তখনও কিছুটা দুর্বল আর আড়ষ্ট হয়ে আছে আমার। কাঁধ পর্যন্ত উঁচুতে তুলতে পারি, তার বেশি তুলতে চেষ্টা করলে ব্যথা পাই। এই দুর্বলতাটার জন্যেই লর্ড নেলসনে রডরিকের সাথে বক্রিংয়ে হেরে গিয়ে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার টাইটেলটা হারাই আমি। যাই হোক, আশা করছি সাঁতার এবং নিয়মিত এক্সারসাইজ করলে আবার ঠিক হয়ে যাবে হাতটা।

শক্তি ফিরে পেয়ে আবার ধীরে ধীরে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা দানা বাঁধতে শুরু করল। ধীরে ধীরে পাগল হয়ে উঠলাম। বিগ গাল আইল্যান্ডের পানিতে ডুবে থাকা ক্যানভাসে মোড়া প্যাকেটটা রোজ রাতে স্বপ্নে দেখি। বুঝতে পারি, পানি থেকে তুলে জিনিসটা কি না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাব না আমি।

ইতিমধ্যে হঠাৎ বাতাসের মোড় ঘুরে গেল, চ্যানেলে পানির উত্তাপ নেমে গেল চার ডিগ্রী, এবং রাতারাতি চলে গেল সব মাছবিদায় নিল আরেকটা মওসুম।

মাছ ধরার যাবতীয় সরঞ্জাম পরিষ্কার করে সেগুলোয় হলুদ গ্রিজ মাখিয়ে তুলে রাখলাম পরবর্তী মওসুমের জন্যে। জলকুমারীকে ফুয়েলিং বেসিনের কাছাকাছি ডক ইয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে মেরামতের কাজে হাত দিলাম আমরা। খোল এবং কীল মেরামত শেষ করে বোটের ওপরের অংশের ক্রটি সারালাম। রি শোল্ডারিঙ, স্যাণ্ড পেপারিঙ, রি বার্নিশিঙ-হাজারটা কাজ, প্রত্যেকটা গভীর মমতা আর কঠোর পরিশ্রম দিয়ে শেষ করলাম আমরা।

কোন তাড়াহুড়ো নেই। আমার পরবর্তী চার্টার পার্টি আসবে তিন হপ্তা পর। ক্যানাডিয়ান এক ইউনিভার্সিটির একদল মেরিন বায়োলজিস্ট।

দিনগুলো ঠাণ্ডা, আরামে কেটে যাচ্ছে। শরীরে ফিরে এসেছে পূর্ণ শক্তি, সুস্থ থাকার আগের সেই পুলক অনুভব করছি মনে। গভর্নমেন্ট হাউজে প্রায়ই ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ পাচ্ছি, কখনও কখনও হপ্তায় দুবারও যেতে হয়। এবং প্রতিবার সবাইকে ব্ল্যাঙ্ক এবং প্যানথারের সাথে আমার লড়াইয়ের গল্পটা আবার নতুন করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শোনাতে হয়। প্রেসিডেন্ট গডফ্রে পিডলের অন্তরে

খোদাই হয়ে গেছে গল্পটা, কবিতা আবৃত্তির মত করে পুরোটা মুখস্থ বলতে পারেন তিনি। বলার সময় ছোট্ট কোন ঘটনার এতটুকু অংশ যদি বাদ পড়ে, অমনি তিনি ক্রটিটা শুধরে। দেন আমার। গল্পের শেষে প্রতিবার উত্তেজিত ভাবে চঁচিয়ে ওঠেন প্রেসিডেন্ট, তোমার ক্ষতের দাগটা ওদেরকে দেখাও, মিস্টার রানা। অগত্যা বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সামনে শার্ট খুলতে হয় আমাকে।

নিরুপদ্রব দিনগুলো শান্তিতে কেটে যাচ্ছে। ইন্সপেক্টর টালি। সেন্ট মেরীতে ফিরে আসেনি আর এবং ছয় হপ্তার শেষ দিকে সাব ইন্সপেক্টর টমসনকে ইন্সপেক্টর এবং কমান্ডিং অফিসারের পদে বরণ করে নেয়া হয়। নতুন দায়িত্ব পেয়ে তার প্রথম কাজগুলোর একটা ছিল এফ এন কারবাইনটা আমাকে ফেরত দেয়া।

বিগ গাল আইল্যান্ডে কবে যাব ভাবনাচিন্তা করছি, এই সময়। এক শুক্রবার সন্ধ্যায় একটা আশ্চর্য খবর পেলাম।

ক্রুদেরকে সাথে নিয়ে লর্ড নেলসনে সাপ্তাহিক উৎসব করছি। তখন আমরা। একটা করে বোতল মাত্র শেষ করেছি, তখনও টেবিলে ল্যাম্পনি তার বেইট নাইফটা গাঁথেনি, এই সময় বারে ঢুকল হিলটন হোটেলের মারিয়া। হিলটনের সুইচবোর্ডে কাজ। করে ও। মাইক প্যানথার এই মেয়েটার গায়েই হাত তুলেছিল।

একটা কোরাস গাইছি আমি আর রডরিক। আজ রডরিকের চেয়ে এগিয়ে আছি আমি, শেষ পদটা গাওয়া শেষ করে লক্ষ্য করছি রডরিক তখনও হেঁড়ে গলায় ষাঁড়ের মত চঁচাচ্ছে, আর সেই সাথে তার শরীর বাঁকানো কসরৎ তো আছেই। মারিয়া। আমার অপর পাশের সিটে এসে বসল।

এক ভদ্রমহিলা আপনার খাঁজ চেয়েছেন, মিস্টার রানা।

ভদ্রমহিলা? কে? কোথায়?

হোটলে, বলল মারিয়া। একজন বোর্ডার আজ সকালের। প্লেনে এসেছেন। আপনার নাম ইত্যাদি সব জানেন তিনি। আপনার সাথে দেখা করতে চান। আজ রাতে দেখা করে খবরটা দেব আপনাকে, বলে এসেছি তাকে।

দেখতে কেমন?

সুন্দরী। এবং ভদ্রমহিলা, মিস্টার রানা।

আমার কেলাসেরই মনে হচ্ছে। মারিয়ার জন্যে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলাম।

যাবেন এখন দেখা করতে?

তুমি যতক্ষণ আমার পাশে আছ, মারিয়া, দুনিয়ার সমস্ত সুন্দরী মেয়েকে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে, হাসতে হাসতে বললাম ওকে। আমার আরও একটু কাছে সরে এল ও। একান্ত যদি যেতেই হয়, আগামীকাল দেখা যাবে।

বলল, মিস্টার রানা। আপনি সত্যিকার একজন ডেভিল, বলে খিলখিল করে হেসে উঠল সে।

মাসুদ, আমার আরেক পাশের সিট থেকে বলল রডরিক। বলব বলব করে যে কথাটা কক্ষণে কোনদিন বলা হয়নি তোমাকে, দুই ঢোকে গ্লাস ভর্তি হুইস্কি শেষ করল সে, সেই কথাটা এখন তোমাকে বলতে যাচ্ছি আমি, চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে তার, ভাবাবেগে কাঁদছে ও। ইউ আর এ গুড বয়, মাসুদ। আই লাভ ইউ, ম্যান। আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসি আমি তোমাকে।

আমিও।

.

কুকুরকু! রাতের শেষ প্রহর, মোরগ ডাকছে। মুখের কাছে হাত তুলে একটা হাই তুলল রানা। ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইছে চোখের পাতা। আজ এই পর্যন্ত থাক, কেমন?

বেচারা! রানার অবস্থা দেখে মায়া লাগল সোহানার। সারারাত জেগে স্মৃতি রোমন্থন করেছে, কিন্তু আর পারছে না ও। ওর এই কষ্ট সহ্য করা যায় না। অপর দিকে গল্পের মাত্র প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে,

বোঝা যাচ্ছে ইন্টারেস্টিং ঘটনাগুলো এই বার একে একে ঘটতে শুরু করবে এই অবস্থায় সে-ই বা ধৈর্য ধরে কিভাবে!

বুঝতে পারছি কষ্ট হচ্ছে তোমার, কিন্তু গল্পের বাকি অংশটার কি হবে? জানতে চাইল সোহানা। ফাঁদ পেতে আবার কবে তোমাকে ধরতে পারব...অফিস থেকে ছুটি নিয়ে হয়ত পালিয়েই যাবে আমাকে গল্প শোনাবার ভয়ে-তখন কি হবে আমার?

দূর, পালাব কেন! হেসে উঠে বলল রানা। একবার যখন শুরু করেছি, শেষ করবই। তবে অনেক বড় গল্প তো, একরাতে। শেষ হবার নয়। আগামী শনিবার আবার বলব, কেমন?

সোহানা প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। এ অন্যায়, রানা, গল্পের এই জায়গায় এসে...

রাত ফুরিয়ে গেলে আমার কি দোষ, বল? আরও সংক্ষেপে। বললে কি ভাল হত? তুমি চাইলে অবশ্য পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শেষ করে দিতে পারি বাকিটুকু। তাই করব?

এই, না...প্লীজ! আমি সব শুনতে চাই, রানার একটা হাত ধীরে ধীরে ওর ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরছে দেখে সভয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল সোহানা। এই...কী হচ্ছে! কথা ছিল গল্প শেষ হলে...

প্রথম পর্ব তো শেষ, হাসল রানা। নগদ পেমেন্ট পছন্দ করি আমি। অন্তত ওয়ান থার্ড পাওনা চুকিয়ে দাও। কথা দিচ্ছি তার বেশি এগোব না। হ্যাঁচকা টানে রানার বুকের সাথে সঁটে এল সোহানা।

পাঁচ মিনিটেই লালচে হয়ে উঠল সোহানার ফর্সা মুখটা। আশ্চর্য একটা ক্ষুধার্ত আকুতি ফুটে উঠল চোখে-মুখে। কাঁপা শ্বাস। দুহাতে জড়িয়ে ধরে পিষে মারতে চাইছে রানাকে বুকের সাথে। ঢোক গিলল।

উহ্! রানা...চুলোয় যাক শর্ত। প্লীজ! এখন থামলে পাগল হয়ে যাব!

বেশ, তুমি যখন এত করে বলছ...ঠিক আছে...

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমে ঢলে পড়ল দুজন বিছানায়।